যুগ খলিফার তাজা নির্দেশনা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসিহ্ আল খামেস

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

যুগ খলিফার তাজা নির্দেশনা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলিফাতুল মসিহ্ আল খামেস

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রকাশনায়	:	তরবিয়ত বিভাগ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
প্রকাশকাল	:	প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০১৫
সংখ্যা	:	১০০০ কপি
শুভেচ্ছা মূল্য	:	২০ টাকা
প্রচ্ছদ	:	মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন

মুখবন্ধ

হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “অতএব তোমরা সাবধান থাক। আল্লাহর শিক্ষা এবং কুরআনের পথ-নির্দেশনার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নিবেনা। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত নির্দেশাবলীর একটিকেও অবজ্ঞা করে, সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির দরজা বন্ধ করে দেয়।” পাপে নিমজ্জিত মানবমন্ডলীর পরিত্রাণের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পথ-নির্দেশনা মোতাবেক মসিহ মাওউদ ও ইমাম মাহদীর আগমন হয় ধরাধামে। জগতের ত্রাতা ও উদ্ধারকারী হিসেবে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর তনু-মন-ধন। আজ জগতের মাঝে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে পরিব্যাপ্তি এবং অপেক্ষমান বিজয়ের সুবাতাস তা সত্যিকার অর্থেই দৃশ্যমান এক বাস্তবত-া। আমাদের পারলৌকিক মুক্তি ও ইহকালের সমৃদ্ধির সমস্ত চাবিকাঠি হলো কুরআন। কুরআনের শিক্ষাই আজ একমাত্র ব্যবস্থাপত্র। ইসলামের নামে ইসলামী সমাজ ও অনুশাসন, আইন ও তরিকা ইত্যাদি কায়েমের জন্য আজ সে আন্দোলন-সংগ্রাম- তা কোনদিনই সত্যি হবেনা, যদি না প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন আসে। তাই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ আহমদী খোদ্দাম-আতফালদের তরবিয়তের জন্য যুগ ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) -এর কয়েকটি খুতবার ও বক্তৃতার এই সংকলন প্রকাশের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকাশনা সার্থক হবে তখনই, যখন আহমদী খাদেম-তিফলগণ এথেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টায় রত থাকবে। কবি নজরুল বলেছেন:

“নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান,
সর্ব ক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির আত্মদান।”

আজ জগতের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত। তাই নিজস্ব পরিমন্ডলে নিজেকে খোদাপ্রাপ্ত হিসাবে যোগ্য করে তুলতে এই সংকলনটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে খাকসার মনে করি। যে সকল ভাই এ বই প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।
মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হোন। আমীন।

ওয়াস্সালাম

মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

১. আহমদীয়াতের মূলকথা ০৬

২. তাকওয়াই সকল সফলতার মূল ২০

৩. আহমদী শিশু-কিশোরদের প্রতি নসিহত ৩৪

৪. নতুন বছরে নব অঙ্গীকার ৪২

৫. "ফাস্তাবিকুল খায়রাত"- পূণ্য কর্মে অগ্রগামী হও ৫৬

৬. ২০১০ - আহমদীয়া জামাতের এক আশিষপূর্ণ বছর 69

প্রতিশ্রুত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাবওয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি 'নুসরত জাহান' স্কিমের অধীনে ঘানার উত্তরাঞ্চলের 'আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল সালাগা'-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দু'বছর সেবা করেন। ঘানায় তিনিই প্রথমবারের মত সফলতার সাথে গমের চাষ আরম্ভ করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি রাবওয়ায় ফিরে যান এবং ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে জামাতের সেবা করেন। ১৯৯৭ সালে খলিফাতুল মসিহ রাবে (রাহে.) তাঁকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তানের নাযেরে আলা (প্রধান কার্যনির্বাহ পরিচালক) ও আমির মোকামি হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি প্রায় ১০ দিনের জন্য খোদার পথে কারাবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০০৩ সালের ২২ এপ্রিল তিনি খলিফাতুল মসিহ খামেস (পঞ্চম) নির্বাচিত হন।

আহমদীয়াতের মূলকথা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاط الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

কিছু দিন হলো, এক কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতার সময় ধর্মীয় তরবিয়তের বিষয়ের একটি জরিপ ঘটনাক্রমে আমার সামনে আসে। এরপর আমি তার কাছ থেকে এ বিষয়ে লিখিত রিপোর্টও আনিয়ে নিই। এটি দেখে আমার মনে হলো, এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রতি আলোকপাত করে আমার কিছু বলা উচিত। এগুলো জামাতের এক শ্রেণীর লোকদের জন্য আবশ্যক। তেমনিভাবে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে যা জামাতের কর্মকর্তাদের জন্যও প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো একদিকে যেমন এখানকার জামাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিশ্বের অন্যান্য জামাতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্ম এবং সেসব সদস্যদেরও জানা প্রয়োজন যারা খুব বেশী সক্রিয় নন বা জামাতের কাজের সাথে খুব বেশী সম্পৃক্ত নন। এগুলো এমন বিষয় যা সাধারণত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয় না অথবা মুরুব্বী এবং কর্মকর্তাগণ জামাতের সদস্যদের সামনে গুছিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করেন না যেমনটি করা উচিত। যার ফলে কারো কারো মাথায় বিশেষভাবে যুবকদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হলেও প্রশ্ন করেন না। আর এর কারণ হলো, তারা হয়ত ভাবেন, জামাতি পরিবেশ বা তাদের কোন নিকট আত্মীয় বা পিতা-মাতা এসব প্রশ্ন শুনে খারাপ ভাবতে পারেন বা তারা কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতে পারেন। অথচ তাদের উচিত ছিল মুরুব্বী এবং মুয়াল্লেমদের কাছে বা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখেন তাদের কাছে বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য ও লাজনা সদস্যা তাদের প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট অংগসংগঠনের কর্মকর্তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া। আর এদের সাথে স্ব স্ব অঙ্গসংগঠনের সম্পর্ক এমনই হওয়া উচিত যেন স্বাচ্ছন্দে প্রশ্ন করে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং নিজেদের মাঝে যেসব সন্দেহ রয়েছে তা দূর করতে পারেন বা আপনারা আমার কাছেও লিখতে পারেন। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকে আমার কাছে লিখেও থাকেন। কখনও কখনও এখান থেকেও একান্ত শিষ্টাচারের সাথে লিখে থাকেন। আর এদের প্রশ্নের উত্তরও দেয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়টিও সামনে এসেছে, অনেক কর্মকর্তাও নিজ নিজ কর্তব্য এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না এবং নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না।

আমি যে বিষয়গুলো বলতে যাচ্ছি এর মাঝে একটি দিক আকিদা এবং এ বিষয়ের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা আমাদের জানা উচিত কেন আমরা কোন একটি আকিদায় প্রতিষ্ঠিত আছি এবং একইভাবে কিছু বিষয় যা আমাদের করতে বলা হয়, যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, কেন আমাদেরকে বলা হচ্ছে একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এটি জরুরী? এর মাঝে একটি হলো, আর্থিক কুরবানী-এবিষয়ে লোকেরা জানতে চায়। দ্বিতীয়তঃ কর্মকর্তাদের কিছু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বাবলী রয়েছে- এগুলো কীভাবে পালন করবে এবং তাদের ক্ষমতা বা দায়িত্ব কতটু-কু। যাই হোক সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রসঙ্গে এ দুটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

প্রথমটি আকিদার সাথে সম্পর্কিত, একজন আহমদীর এটি জানা আবশ্যক। সাধারণত এ বিষয়ে আলোকপাত হতে থাকে কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকদেরও তরবিয়তের প্রয়োজন আছে– এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে আলোকপাত করা হয় না। সাধারণভাবে মনে করা হয়, একজন জন্মগত আহমদী সে হয়ত এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু সে কি জানে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কি উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাকে মান্য করা কেন জরুরী? নবাগতরা তো এটি ভালভাবে জানেন কেননা তারা পড়ালেখা করে, গবেষণা করে বয়াত করে থাকেন কিন্তু যারা তেমন সক্রিয় নন, ইজতেমাগুলোতে সঠিক-ভাবে আসেন না, জলসায় অংশগ্রহণ করেন না- এমন লোক স্বল্প সংখ্যক হলেও সবদেশেই রয়েছে। এদের প্রতি গভীর উদ্বেগের সাথে দৃষ্টি দেয়া উচিত আর এজন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংগঠনকেও নিজ নিজ কর্মসূচী তৈরি করে সে অনুয-ায়ী কাজ করা একান্ত আবশ্যক। তেমনিভাবে জামাতের ব্যবস্থাপনারও উচিত এমন লোকদের তিরস্কার না করে বা তাদের সংশোধন হতে পারে না-এমন কথা না বলে তাদেরকে কাছে টানার চেষ্টা করা। তবে যারা অকপটে বলে দেয়, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু এমন লোকদের ক্ষেত্রেও জামাতের মূল ব্যবস্থাপনার উচিত তাদের তথ্যাদি অংগ সংগঠনকে দিয়ে দেয়া কেননা কখনও কখনও কোন কোন বড় কর্মকর্তার কঠোর আচরণের কারণে অনেকে এমন বলে দেয়। অংগ সংগঠন তাদের সম বয়সী বা প্রায় একই মেজাজের লোকদের মাধ্যমে তাদের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। যেখানে যেখানে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে সফলতাও লাভ হয়েছে। কোন কোন স্থানে এমনও সেক্রেটারী তরবিয়ত আছেন যারা তরবিয়তের লক্ষ্যে তাদের স্বভাবগত অবস্থাকে সামনে রেখে কর্মসূচী তৈরি করেছেন এবং এর ভাল ফল হয়েছে, এর সুপ্রভাবও পড়েছে। তাদের পক্ষ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। যাই হোক প্রত্যেক আহমদীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এটি প্রত্যেক কর্মকর্তা, প্রত্যেক মুরুব্বী, সর্বস্তরের অংগসংগঠনের এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব।

নীতিগত এই কথার পর আমি প্রথম যে কথাটি বলতে চাই তাহলো, প্রত্যেক আহমদীর

জানা প্রয়োজন, হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর আগমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? তাঁকে মান্য করা কেন জরুরী? এ প্রসঙ্গে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর ভাষাতেই বলা সঙ্গত মনে করেছি। তিনি (আ.) বলেছেন, "আমি মহানবী (সা.)-এর হারানো সম্মানকে পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্ববাসীকে দেখানোর নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছি। আর এ সব কাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এগুলো দেখতে পায় না। অথচ এখন এই জামাত সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে আর এই জামাতের নিদর্শন ও সত্যতার সাক্ষী এত লোক আছে, তাদেরকে যদি একত্র করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত হবে যে পৃথিবীর বুকে কোন বাদশাহ্‌রও এমন বিশাল বাহিনী নেই"। তিনি (আ.) বলেন, "জামাতের সত্যতার এমন এমন দৃশ্য রয়েছে যে, এর সবগুলো বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। যেহেতু ইসলামের চরম তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করা হয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তা'লা এই তাচ্ছিল্য ও অবমাননার কারনে এই জামাতকে মর্যাদা ও সম্মানও দেখিয়েছেন" (মলফূযাত : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯, সংস্করণ-২০০৩, রাবওয়া)। আর এটি কেবল হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশারই কথা নয় বরং তিনি তাঁর রচনাবলীতে, তার পুস্তকাদিতে, তার বিভিন্ন বক্তব্যে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে যেভাবে আলোকপাত করে গেছেন এগুলো আজও মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে শত্রুদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করছে।

আমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি, যখন অমুসলমানদের সামনে মহানবী (সা.)-এর সীরাতের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় তারা তখন বলতে বাধ্য হন, যদি তাঁর সীরাত এমনই হয়ে থাকে, তাঁর শিক্ষা যদি এমনই হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে আমরা ভ্রান্তির মাঝে ছিলাম। আমি কিছুদিন পূর্বে কোন এক বক্তৃতায় কানাডার এক ইসলাম বিদ্বেষীর উদাহরণ দিয়েছিলাম যে তাদের ড্যানিশ পত্রিকায় তার এক প্রবন্ধে কার্টুনও প্রকাশ করেছিল, সে এবারকার সফরে যখন আমার বক্তব্য শুনেছে এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছে তখন সে তাদের পত্রিকায় লিখতে বাধ্য হয়েছে যে, আহমদীয়া জামাতের ইমামের কথা শুনে আমি প্রকৃত সত্য জেনে গেছি এবং পাশাপাশি সে তার ভুলও স্বীকার করেছে। তেমনিভাবে বিগত এক খুতবায় আমি বলেছিলাম, আমেরিকার এক বড় রাজনীতিক জুমআর বিষয়ে বিভ্রান্তিকর অনুষ্ঠান তাদের রেডিওতে প্রচার করে বা এ বিষয়ে কথা বলে আর এই রেডিওর শ্রোতা প্রায় লাখ খানেক। এ প্রেক্ষিতে, আমাদের এক আহমদী পবিত্র কুরআনের আলোকে যুবক জুমআর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কী?–এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে ওয়েব সাইটে তুলে দেয়। এরপর সেই ব্যক্তিকে যিনি সেখানকার বড় রাজনৈতিক নেতা এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তাকে লিখে, তুমি ভুল বলেছ তাই এখন আমাদেরকেও রেডিও-তে সময় দাও। অতঃপর সেই ব্যক্তি সময় দেয়, যাই হোক তার মাঝে ভদ্রতা ছিল। আল্লাহ তা'লার ফজলে আমাদের সেই আহমদী যুবক সেই

রেডিও-তে জুমআর মাহাত্ম্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আলোকে কথা বলেছে এর ফলে ঐ ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, তার ভুল হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানও লক্ষ লোক শুনেছে। তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারি। অতএব হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যা কিছু বলে গেছেন এবং যেসব তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচণ করেছেন এসব কিছুর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত করেছিলেন যেন তিনি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করেন এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও মাহাত্ম্য এবং এর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর কাছে স্পষ্ট করেন।

অতএব তিনি (আ.) যেমন বলেছেন, ইসলাম, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য ধরাপৃষ্ঠে পুনরায় তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব আমাদের মাঝে কোন ধরণের হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং যুবকদের এ বিষয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়চিত্ত থাকা উচিত। যেখানে যেখানে যুবকরা সক্রিয় সেখানে আল্লাহ তা'লার ফজলে তারা আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করছে।

এরপর আমাদের সকলের এ বিষয়টিও জানা আবশ্যক, হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানা কেন জরুরী? তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েরাও এ প্রশ্ন করে থাকে। পিতা-মাতা তাদের এমন প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেন না। এ প্রসঙ্গে আমি আবারো হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় বলছি, এটি একটি বিস্তারিত বক্তব্য, এটিকে অংগসংগঠন পরবর্তীতে খন্ড খন্ড করে ব্যবহার করতে পারে এবং এথেকে বিস্তারিত পথনির্দেশ লাভ করতে পারে। একবার কিছু মৌলভী তাঁকে (হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-কে) প্রশ্ন করলো, আমরা এখন নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমানও রাখি, এ সত্ত্বেও আপনাকে মান্য করা কেন আবশ্যক? তিনি (আ.) এর উত্তরে বললেন, "দেখ! যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এবং কিতাবে ঈমান রাখার দাবী করে, আর এর শিক্ষামালা যেমন নামায, রোযা , হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া তাহারাত পালন করে না এবং আত্মার সংশোধন করা, মন্দ পরিহার করা এবং পুণ্য অর্জনের বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে তা মেনে চলে না সেই ব্যক্তি মুসলমান আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়।" মুসলমান হবার দাবী করছে কিন্তু সে সকল পুণ্যকাজ করে না, মন্দ কর্ম পরিহার করে না, উত্তম পন্থা অবলম্বন করে না। তিনি (আ.) বলেন, "এমন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলার অধিকার রাখে না এবং তার উপর ঈমানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত হবার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না। তেমনিভাবে যে মসিহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানে না বা মানা আবশ্যক মনে করে না সেও ইসলামের গুঢ় তত্ত্ব এবং নবুওয়তের উদ্দেশ্য ও রিসালতের লক্ষ্য সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত।" অর্থাৎ সে বুঝেই না নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা কী? এর কী কী উদ্দেশ্য? "আর সে প্রকৃত মুসলমান এবং আল্লাহ্‌র প্রকৃত অনুগত বান্দা আখ্যায়িত হবার যোগ্যই নয়। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে বিধিনিষেধ

দিয়েছেন তেমনিভাবে আখেরী যুগে একজন আখেরী খলিফার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও জোরালোভাবে দিয়েছেন। আর তাঁর অমান্যকারী এবং তাঁর থেকে যারা বিমুখ হবে তাদের নাম 'ফাসেক' রেখেছেন। কুরআন এবং হাদীসে শব্দগত যে পার্থক্য (তা কোন পার্থক্য নয় বরং ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র) রয়েছে তা হলো, পবিত্র কুরআনে খলিফা শব্দ বলা হয়েছে এবং হাদীসে এই আখেরী খলিফাকে মসিহ মাওউদ নাম ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআন যে ব্যক্তির আবির্ভাবের বিষয়ে 'ওয়াদা' (অর্থাৎ অঙ্গিকার) শব্দ ব্যবহার করেছে তেমনিভাবে যে ব্যক্তির আবির্ভাবকে এক বিশেষ বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য দান করেছে, ঐ ব্যক্তি কেমন মুসলমান যে বলে তাঁকে মান্য করার আমাদের প্রয়োজন কী?"

তিনি (আ.)বলেন, "ইসলামে খলিফার আগমনকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন এবং ইসলামের একটি বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য হলো, এর সমর্থন ও নবায়নের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ এসেছেন এবং আসতে থাকবেন। দেখ! আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন।" অনেকে মুজাদ্দেদের বিষয়ে কখনও কখনও ভুল করে বসেন, যদি মুজাদ্দেদ আসতে থাকেন তাহলে খলিফা কে হবেন? জেনে রাখুন, খলিফাই মুজাদ্দেদ হবেন আর এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত একটি খুতবাও দিয়েছি। তা থেকেও বিভিন্ন নোট নেয়া যেতে পারে। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন। জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তকেও এগুলো রয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, "দেখ! আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন আর এটি 'কামা' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত। মুসা (আ.)-এর শরীয়তের শেষ খলিফা হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন। যেমন তিনি নিজেই বলেন, আমিই শেষ ইট। তেমনি-ভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তেও এর খেদমত ও নবায়নের জন্য সব যুগেই খলিফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবেন এভাবে সাদৃশ্যকে বজায় রেখে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রেক্ষিতে শেষ খলিফার নাম মসিহ মাওউদ রাখা হয়েছে। আর তাঁর উল্লেখ সাধারণভাবে করা হয় নি বরং তাঁর আগমনের লক্ষণাবলী সকল ঐশী গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল, ইঞ্জিল, হাদীস এবং পবিত্র কুরআনেও তার আগমনের লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সকল জাতি যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমান সবাই তার আবির্ভাবে বিশ্বাস করে এবং সবাই অপেক্ষমান। তাকে অমান্য করা কীভাবে ইসলামের শিক্ষা হতে পারে? আর তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন যার জন্য আকাশেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন এবং ভূ-ধামেও তিনি মোজেজা বা নিদর্শন দেখিয়েছেন। তাঁর সমর্থনে প্লেগ হলো এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হলো। অতএব এমন ব্যক্তি যার সমর্থনে আকাশ নিদর্শন প্রকাশ করে এবং পৃথিবীও বলে উঠে 'আল ওয়াক্ত' অর্থাৎ এটিই সেই সময়- সে কি কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব হতে পারেন যাকে মানা না মানা সমান? তাকে না মেনেও মুসলমান এবং খোদার প্রিয় বান্দা

হবে? কখনও নয়।”

তিনি (আ.) বলেন, “স্মরণ রেখো, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আগমনের সকল লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য পৃথিবীকে নোংরা করে দিয়েছে। মুসলমান আলেম উলামা এবং অধিকাংশ ওলি-আওলিয়া এই যুগকেই প্রতিশ্রুত মসিহর যুগ আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, সেই মহাপুরুষ চতুর্দশ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হবেন।” তিনি (আ.) বলেন, “আওলিয়াদের এবং অধিকাংশ আলেম-ওলামার সম্মিলিত সাক্ষ্যের পরও যদি কেউ সন্দেহ রাখে তবে তার উচিত পবিত্র কুরআনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা এবং সূরা নূর গভীর মনোযোগের সাথে পড়া। দেখ, হযরত মুসা (আ.)-এর চৌদ্দশত বছর পর যেমন হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন তেমনিভাবে মহানবী (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতেই প্রতিশ্রুত মসিহ আবির্ভূত হয়েছেন। আর যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) মুসাঈ সিলসিলার খাতামুল খুলাফা ছিলেন তেমনিভাবে এ ধারাতেও প্রতিশ্রুত মসিহ খাতামুল খুলাফা হবেন।” (মলফুযাত : ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫১-৫৫২, সংস্করণ-২০০৩, রাবওয়া) অর্থাৎ এখানে জেনে রাখুন, তিনি খাতামুল খুলাফার বিষয়ে বলেছেন, আমি শেষ হাজার বছরের জন্য খলিফা আর এর পর যে-ই আসবে সে তাঁর অনুসরণেই আসবে।

সুতরাং যেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসিহর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করার কথা ছিল আর এটি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতএব তাঁর পুস্তকাদী পড়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। ইংরেজী ভাষা-ভাষি বা অন্যান্য দেশে যারা উর্দূ জানেন না তাদের প্রত্যেকের উচিত যতটুকুই বই-পুস্তক রয়েছে এগুলো পড়ে নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা। আর আল্লাহ্ তা'লার ফজলে বিভিন্ন ভাষায় যে বই-পুস্তক রয়েছে সেগুলোতে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং তাঁকে মান্য করা কেন আবশ্যক- এসব বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে। আর আপত্তিকারীদের আপত্তির উত্তর দিন। আপনারা যদি নিজেরা উত্তর তৈরি করেন তাহলে আপনাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি হবে এবং আপত্তিও উঠবে আপত্তির উত্তরও তৈরি হয়ে যাবে। প্রত্যেকে নিজে তৈরি করা ছাড়াও তাঁর (আ.) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কী এবং তাকে মান্য করা কেন জরুরী, কিভাবে আমরা এ সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যক্তি পর্যায়ে পৌছাবো -এ বিষয়ে জামাতের ব্যবস্থাপনাকেও এবং অংগসংগঠনে-কও নিজেদের কর্মসূচী তৈরি করা উচিত।

এতক্ষন আকিদাগত বিষয়ে আমি আলোকপাত করেছি। এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি তরবিয়তের জন্য প্রয়োজন তা হলো, জামাতের সাধারণ সদস্যদের খলিফার সাথে সম্পর্ক। খেলাফতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর মত একটি মাধ্যমও দিয়ে রেখেছেন। তেমনিভাবে alislam.org ওয়েবস-াইটও রয়েছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর, যুবকদের, নারী-পুরুষের এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং অংগসংগঠনে-

কও এর সাথে সম্পৃক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবানদের একটি বড় সংখ্যা এমন আছেন যারা এখানে মসজিদে একান্ত চেষ্টা-সাধনা করে এসে খুতবা শুনেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমটিএ-র মাধ্যমেও খুতবা শুনেন এমনকি নিয়মিত শুনেন বরং অনেকে এমন আছেন যারা আমাকে লিখেছেন যে, তারা দু তিনবার শুনেন। কিন্তু এমন একটি সংখ্যাও রয়েছে যারা খুতবা শুনেন না। এখানে ইউকে-তেও এমন লোক আছেন যারা খুতবা শুনেন না এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখেন না এমনকি কোন কোন অনুষ্ঠানে এরা অংশগ্রহণও করেন না। কোন এক জামাতে বড় সংখ্যায় লোকেরা জামাতের শিক্ষা পরিপন্থি কাজ করায় বাধ্য হয়ে তাদের প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তদন্ত করা হলে জানা যায়, তাদের মাঝে অধিকাংশই এমন যারা খুতবা শুনে না বা জামাতের সাথে সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। আর এরা জামাতী অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু তাদের রক্তে যেহেতু জামাতের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাই যখন তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল বা সামান্য শাস্তি দেয়া হল তখন তারা অস্থির হয়ে একান্ত উদ্বেগ ও বেদনার সাথে আমার কাছে ক্ষমার চিঠি লেখা শুরু করল। আমার সাথে সাক্ষাতকালে অনেকে কান্নাকাটিও করছিল। তারা যদি কেবল দুনিয়াদারই হতেন তাহলে তাদের মাঝে এমন অনুতাপের অবস্থা সৃষ্টি হতো না। অতএব অনেকে এমন আছেন যারা জাগতিক কাজের কারনে উদাসীন হয়ে যান এবং যখন তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন তারা অনুতপ্তও হন, তওবা ও ইস্তেগফারও করেন এবং পরবর্তীতে জামাতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টাও করেন।

অতএব স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং নিগরানী রাখাও জামাতের ব্যবস্থাপনা, সেক্রেটারী, মুরুব্বী এবং অংগসংগঠন সকলের দায়িত্ব। খেলাফতের সাথে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে চেষ্টা করুন। তাদের হৃদয়ে খেলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং বিশ্বস্তত-াকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন যার উপাদান প্রথম থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। যখন তাদেরকে বুঝানো হয় তখন তারা আরো স্পষ্টভাবে সামনে আসে। যদি কোন মরীচিকা পড়েই থাকে তাহলে তা এর ফলে দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা যখন তাদের বিশ্বস্ততার বহি:প্রকাশ ঘটে, যখন মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় তখন এর বহি:প্রকাশ জোরালো হয়ে থাকে।

যদি তরবিয়তী বিভাগ প্রতিনিয়ত যুগ খলিফার সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বুঝাতে থাকে এবং খুতবা, জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে তাহলে একদিকে খেলাফতের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠবে অপরদিকে তরবিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা॥

পরবর্তী যে কথাটির দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, জামাতের সকল সদস্যদের মাঝে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করা। স্মরণ রাখবেন, আর আমি এটি সাধারণত সকল সেক্রেটারী মালকে বলে থাকি যে, সকল সদস্যকে বলুন, চাঁদা কোন ট্যাক্স বা কর

নয় বরং এটি সেই সমস্ত ফরজ কাজগুলোর একটি যেগুলো আদায়ের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। একস্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

অতএব তোমার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং শোন ও আনুগত্য কর এবং খরচ কর কেননা এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যে নিজেকে কৃপণতা থেকে রক্ষা করে এরাই এমন লোক যারা সফলকাম হবে।

তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ্ পরম গুণগ্রাহী ও পরম সহিষ্ণু। (সূরা তাগাবুন : ১৭ ও ১৮)

অতএব এসব আয়াত হতে স্পষ্ট, খোদার পথে খরচ করা একজন মোমেনের জন্য একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। যারা খোদার রাস্তায় খরচ করেন তারাই সফলকাম হবেন। আরও বলেন, খোদার রাস্তায় তোমাদের খরচ করা এমন যেমন তোমরা আল্লাহ্কে কোন ঋণ দিয়েছ এবং আল্লাহ তা'লা সেই সত্ত্বা যিনি বান্দাকে তার কুরবানীর প্রতিদানে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। এমন অসংখ্য লোক আমাকে লিখেন, আমরা খোদা তা'লার রাস্তায় চাঁদা দিয়েছি এবং আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকবার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাও করেছি। আল্লাহ তা'লা অমুখাপেক্ষি এবং সর্বনির্ভরস্থল, আমাদের টাকা-কড়ির তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। মূলত, আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, আমাদের আনুগত্যের মান দেখার জন্য, আমাদের তাকওয়ার পথ অন্বেষণ করা প্রত্যক্ষ করার জন্য, আমাদের আর্থিক কুরবানীর দাবীর প্রকৃত মান দেখার জন্য খোদা তা'লা বলেন, আমার রাস্তায় খরচ কর, আমার ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য খরচ কর।

অতএব এই গুঢ় তত্ত্বটি প্রত্যেক আহমদীর বুঝা উচিত যে, আমরা চাঁদা কেন দেই? যদি কোন সেক্রেটারী মাল বা কোন জামাতের প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য বা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকে তাহলে এমন চাঁদা দেয়ার কোন উপকারিতা নেই, বরং না দেয়াই ভাল। যদি অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হয়ে চাঁদা দিয়ে থাকেন তাহলে এরও কোন লাভ নেই। মোটকথা, যদি চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয় সেক্ষেত্রে তা খোদা তা'লার কাছে অগ্রহনীয় হতে পারে।

অতএব চাঁদা দাতাদের এমন চিন্তা রাখা উচিত যে, তারা চাঁদা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এটি তাদের প্রতি খোদা তা'লার একটি পরম অনুগ্রহ। এমন নয় যে, কোন ব্যক্তির প্রতি বা জামাতের প্রতি বা আল্লাহ তা'লার জামাতের প্রতি তারা চাঁদা দিয়ে অনুগ্রহ করছে।

অতএব প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে নিজেদের মাঝে এই চিন্তা-ধারা রাখতে হবে যে, তারা চাঁদা দিয়ে খোদা তা'লার আশিষের উত্তরাধিকার হবার চেষ্টা করছেন। ঐশী জামাতের জন্য আর্থিক কুরবানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই আমি সকল জামাতকে বলেছি, নও-মোবাঈন এবং শিশু-কিশোরদেরও ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় বেশী বেশী অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করুন, এক পয়সা দিয়েও যদি কেউ এতে শামিল হয় হোক, যেন সে অভ্যস্ত হয় এবং আল্লাহ তা'লার আশিষ লাভ করতে পারে।

চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবীতে মানুষ অর্থকে অনেক বেশী ভালোবাসে, আর এ কারণেই স্বপ্নের তাবীরের গ্রন্থে লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে তার কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ। একারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং ঈমান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'লা বলেছেন, লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন (সূরা আলে ইমরান : ৯৩)। প্রকৃত পুণ্য তুমি কখনও অর্জন করতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ হতে খরচ না করবে। কেননা খোদার সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা এবং সদাচরণের একটি বড় অংশ অর্থ খরচ করার প্রয়োজন ঘোষণা করে এবং মানুষ ও আল্লাহ্‌র অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা একই জিনিষ যা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এটি ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় হয় না। মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করলে সে অন্যের মঙ্গল সাধন কীভাবে করবে? অন্যের ভাল করা এবং সহমর্মিতার জন্য ত্যাগ স্বীকার একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। আর 'লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন' আয়াত সেই ত্যাগ স্বীকারের দিকেই নির্দেশ করছে। অতএব আল্লাহ তা'লার রাস্তায় অর্থ খরচ করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তার তাকওয়াশীল হবার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সাব্যস্ত করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে আল্লাহর জন্য উৎসর্গের গুণ ও মান এমন ছিল যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি বাসার সব জিনিষ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।" (মলফুযাত : ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৬৭-৩৬৮, ২০০৩ সালে রাবওয়া থেকে পুণ:মুদ্রিত)

অতএব সেক্রেটারী মালের এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তরবিয়ত করা প্রয়োজন যে, মালি কুরবানী করলে তাকওয়া ও ঈমান সুদৃঢ় হয়। তেমনিভাবে মুরুব্বীদেরও উচিত যখনই সুযোগ পাবেন এ বিষয়ে নসীহত করবেন। এর জন্য অব্যহতভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাই সেক্রেটারী মালকে সর্বস্তরে সক্রিয় হতে হবে। সেক্রেটারী মালের কাজ হলো নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং নিজের যোগাযোগ যেন ব্যক্তি পর্যায়ে থাকে। সাহায্য করার জন্য অংগসংগঠনের কাঁধে পুরো দায়িত্ব দিয়ে দেয়া উচিত নয়। অংগসংগঠন কেবল এতটুকু সহযোগিতা করবে, তারা নিজ নিজ সদস্যদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে থাকবে, এর চেয়ে বাড়তি সহযোগিতা অংগসংগঠনের কাজ নয়। অংগসংগঠন তাদের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে, তারা যেন সেক্রেটারী মালের সাথে সহযোগিতা করেন। আর

চাঁদার মূল উদ্দেশ্যকে বুঝান। মোটকথা চাঁদার গুরুত্ব বুঝানো অঙ্গসংগঠনগুলোর কাজ। কিন্তু সেক্রেটারী মালরা এই বলে এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না যে, আমরা অংগ সংগঠনগুলোকে বলেছি কিন্তু তারা আমাদেরকে কোন সহযোগিতা করেনি। এ দায়িত্ব তাদের, আর এটিকে তাদেরই পালন করতে হবে। সেক্রেটারী মালদের কাজ হলো, তারা যেন প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ে এবং ঘরে পৌঁছার চেষ্টা করে। এখন তো অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, ফোন রয়েছে এবং অন্যান্য মাধ্যমও রয়েছে। বাহনের সুযোগ সুবিধা ইউরোপে অনেক বেশি। পাকিস্তানে এমন এমন সেক্রেটারী মালও ছিলেন যারা সারা দিন কাজ করতেন। সন্ধ্যা অথবা রাতে যখনই তাদের কাজ শেষ হতো এরপর তারা ঘরে ঘরে যেতেন, যেমন বড় বড় শহর করাচি, লাহোরে তারা সাইকেলে আরোহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন আর নসিহত করতেন। আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। কিন্তু এখানে আপনারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তারপরও আপন-ারা কাজ করছেন না। বরং অনেক সেক্রটারী মালের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তা নিজের চাঁদার বাজেটই মানসম্মত নয়। নিজের চাঁদার বাজেটই যদি সঠিক না হয় তাহলে অন্যকে সে কীভাবে উপদেশ দিবে! এই কাজ প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে করতে হয়। মালী কুরবাণীর গুরুত্ব বুঝাতে হবে। অনেকেই মন্দ আচরণ করেন। এক্ষেত্রে একবার অস্বীকার করলে দ্বিতীয় বার যান। তৃতীয়বার যান, চতুর্থবার যান। কিন্তু বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তি এমন মনে করা উচিত নয়, তার চাঁদায় জামাত চলে আর এজন্য সেক্রেটারী মাল বার বার আসেন।

এটা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা, কখনো আর্থিক সংকট হবে না। কাজ চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। হ্যাঁ, তাঁর চিন্তা ছিল, যে অর্থ খরচ হবে সেটা সঠিকভাবে হবে কিনা। (আল-ওসিয়্যত রূহানী খাযায়েন : ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯ দ্রষ্টব্য) আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খরচ যথা সম্ভব সঠিক পদ্ধতিতে করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। কোন কোন জায়গায় খোলা হাতে খরচ হয়ে থাকে সেখানেও দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে। এজন্য জামাতে অডিটের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর খরচগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা জামাতের আমীরেরও দায়িত্ব। বিল আসলেই পাশ করতে হবে এটা আবশ্যক নয়। অডিট ব্যবস্থাকে অধিক সক্রিয় রাখুন। এমন ভাবে সক্রিয় রাখুন তারা যেন স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন। তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে কাজ করতে দিন। খরচের ব্যাপারে আমি বলে দিচ্ছি, এম টি এ এর ক্ষেত্রে অনেক বড় খরচ করা হয়ে থাকে আর এর জন্য পৃথক তাহরীকও করা হয়ে থাকে যদিও এখন খরচ এত বেড়ে গেছে যে, শুধু এই অর্থ দিয়ে এমটিএ-এর খরচ নির্বাহ হয় না। জামাতে অন্যান্য সামগ্রিক বাজেট থেকেও খরচ করা হয়ে থাকে। কেননা সমগ্র বিশ্বের জন্য এমটিএ-এর মোট পাঁচটি স্যাটেলাইট কাজ করে যাচ্ছে। তাই এ দিকেও মনোযোগ বা দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ইংল্যান্ডের জলসার দ্বিতীয় দিনের আমার বক্তব্য যদি কেউ

মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে তাহলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের টাকা পয়সায় কত বরকত দিচ্ছেন। আর কীভাবে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কাজ কত সম্প্রসারিত হয়েছে আর আল্লাহ তা'লা প্রতিবছর কীভাবে এই টাকায় বাড়তি ফল এনে দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এই সমস্ত খরচ সদস্যদের আর্থিক কুরবানী দ্বারাই নির্বাহ করা হয়।

এ ছাড়া আজ আমি আরও কিছু জামাতী বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, যুগ খলিফার খুতবা শুনাও অতি আবশ্যকীয় বিষয়। অথবা বিভিন্ন সময়ে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয় এগুলো নিয়ে ভাবা এবং নোট করা আবশ্যকীয়। যেখানে জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় সেখানে কর্মকর্তারা নিজেরা সেদিকে মনোযোগ দিন। জামাতের আমীরের এটা কাজ যদি খুতবাতে কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়, এবং যদি তরবিয়ত সংক্রান্ত কোন বিষয় থাকে তাহলে এটাকে তাৎক্ষণিক নোট করে যেন জামাতের প্রেসিডেন্টদের সার্কুলার করা হয়। আর এর উপর কতটুকু কাজ হচ্ছে এটা যেন নিয়মি-তভাবে তদারকি করা হয়। হয়তো অনেক জামাত এটা করে থাকে। কিন্তু রিপোর্ট অনুস-ারে, এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আমেরিকা জামাতের আমীর সাহেবই নিয়মিতভাবে নোট করেন, আর খুতবায় যে কথা বলা হয়, যে নির্দেশনা দেয়া হয় সেটাকে সার্কুলার হিসেবে প্রেরণ করে থাকেন এবং সবার কাছে পৌঁছান। বাকিদেরও এর উপর আমল করা উচিত। ইংল্যান্ড একটি ছোট দেশ এখানে যদি সঠিকভাবে এ বিষয়ে কাজ করা হয় তাহলে সব জামাতের মধ্যে তারা সবচেয়ে ভাল ফল লাভ করতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে আমার পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা পাঠানো হয় এক্ষেত্রে আপনাদের কাজ হলো, এগুলোকে দ্রুত জামাতগুলোতে পৌঁছানো। এরপর এগুলোকে ফলোআপ করুন, এর ফিডব্যাক নিন।

তেমনিভাবে রিজিওনাল আমীর বানিয়ে জামাতের ন্যাশনাল আমীরের এটা ভেবে বসে থাকা উচিত নয় যে, রিজিওনাল আমীররা কাজ করছেন, সব কাজের দায়িত্ব তাদের উপর-এমন হওয়া উচিত নয়, আর এটি সঠিক পন্থাও নয়। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যে বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে এসেছে তা হল দেশীয় কেন্দ্র এবং জামাতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বরং এটাও মনে করা হচ্ছে যে আমরা কেন্দ্র পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছতে পারিনা অর্থাৎ দেশীয় কেন্দ্র পর্যন্ত। এই অনুভূতি দূরীভূত হওয়া অবশ্যক। এই জন্য এখানে এবং অন্যান্য জায়গাতে জামাতের আমীরকে এ বিষয়ের উপর আমল করা উচিত যাতে বছরে দুইবার প্রেসিডেন্টদের সাথে মিটিং হয় এবং তাদের কাজের অগ্রগতির হিসাব নেওয়া হয়। আর যেসব প্রেসিডেন্ট দৃষ্টি আর্কষণের পরও কাজ করেননি তাদের রিপোর্ট আমাকে পাঠান। এভাবে সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তরবিয়ত, সেক্রেটারী তবলীগের সাথে যদি বছরে দুইটি মিটিং নাও করতে পারেন তবে একটি মিটিং অবশ্যই করা আবশ্যক এবং তাদের কাজের হিসাব নিন। যদি এই সেক্রেটারীগণ সক্রিয় হয়ে যান তাহলে অন্যান্য বিভাগগু-

লার সেক্রেটারীগনও এবং অন্যান্য বিভাগের সমস্যাগুলো আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে। তাই আজ থেকে ন্যাশনাল আমীর এ বিষয়ে নিজের কর্মসূচী তৈরী করুন- কিভাবে প্রত্যেক জামাতে নিজে পৌঁছে জামাতি ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করবেন। ইউকে এবং যেসব ছোট দেশ রয়েছে তাদের জন্য এগুলো কঠিন কাজ নয়। কেন্দ্রে অথবা যেকোন রিজিয়নে মিটিং এর জন্য একত্রিত করা যেতে পারে। যেগুলো বড় দেশ রয়েছে যেমন আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি তারা এ বিষয়ে নিজেদের কর্মপদ্ধতি বানিয়ে নিন কিভাবে প্রত্যেক স্তরের জামাতগুলোর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সক্রিয় করবেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ব্যাপারে পূর্বেও আমি কয়েকবার বলেছি, জামাতের সদস্যদের সাথে ভালবাসা এবং কোমল ব্যবহার করুন। ইউকে-এর শূরাতে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি যা বলেছি তা প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানো উচিত। আর তবশীর বিভাগ এটাকে সব জায়গাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিন। ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাচ্ছি, কর্মকর্তারা যেন তাদের নিজ নিজ বিভাগের ধারাগুলো অবশ্যই অধ্যায়ন করেন। আইন-কানুনের ব্যাপারে প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের জানা আবশ্যক তাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি, তাদের ক্ষমতা কতটুকু? ন্যাশনাল আমীরের জন্য একটি নির্দেশনা হলো, তিনি বিভাগীয় আমীরকে যে কাজ এবং অধিকার দিবেন সে বিষয়ে যেন কেন্দ্রকে অবহিত করেন। আমার মনে হয় কোথাও এ ক্ষেত্রে কোন কাজ হচ্ছে না। কেননা এখন পর্যন্ত কোন স্থান থেকে এমন কোন চিঠি আসে নি যে, আমরা উমুক বিভাগে আমীর নিযুক্ত করেছি এবং তাকে উমুক উমুক দায়িত্ব দিয়েছি। ধারা নম্বর ১৭৭-এ স্পষ্টভাবে লেখা আছে, এখন এর খুবই প্রয়োজন। এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আমীরগণ অবশ্যই নীতিমালার বই থেকে ধারা নম্বর ২১৫ থেকে ২২০ পর্যন্ত পড়ুন এবং এগুলোকে নিজেদের মাথায় রাখুন আর এতে আমল করুন বিশেষভাবে যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার হয়। (তাহরীকে জাদীদের বিধি-বিধানের ২০০৮ সংস্কারনের ২৫৯-২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

এখানে আমি মুবাল্লেগদেরও স্মরণ করাতে চাই, আপনাদেরও উচিত নিজেদের দাযিত্ব সঠিকভাবে পালন করা। আপনাদের দায়িত্বাবলীর মাঝে জামাতে কুরআন পড়ানোর ব্যবস্থা করাও একটি দায়িত্ব। আপনারা যদি কোন সফরে যান সেক্ষেত্রে এমন শিক্ষক তৈরি করুন যারা শিশু-কিশোরদেরকে এবং যারা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে পারেন। আর এটি নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন হলো- এমন যেন না হয়। মাগরিব বা এশার সময় যখনই সময় পান পড়ান। আর যদি মুরুব্বী ও মুবাল্লেগগণ সফরে না থাকেন তিনি যদি নিজ সেন্টারে উপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি তার সেন্টারে ক্লাস নিবেন। এ বিষয়ে অনেক অভিযোগ আসছে যে, আমাদের শিশু-কিশোরদের কুরআন পড়ানোর কেউ নেই তাই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে কখনও কখনও অ-আহমদীদের কাছে যেতে হচ্ছে। তেমনিভাবে যাদেরকে কায়দা পড়ানো

প্রয়োজন তাদেরকে কায়দা পড়ান। এভাবেও ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে মসজিদের সাথে, সেই সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবেন। আর এটি তরবিয়তের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে। আর কুরআন করীম পড়ানোর যে উপকার আছে তা তো আছে, এটি তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুবাল্লেগদের এটিও স্মরণ রাখতে হবে, সাধারণত তিন চার বছর পর পর সে দেশেই যেখানে সে অবস্থান করছে তাদের বদলি হয় আর প্রয়োজন হলে এর আগেও বদলি হয়ে যায়। এমন হলেও অনেক সময় কোন কোন দেশ থেকে অভিযোগ আসে, খুবই ইতস্ততবোধ করেন, এমন বদলিকে আনন্দের সাথে মেনে নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'লার ফজলে এখানে ইউকের মুবাল্লেগদের মাঝে এমন বিষয় নেই, এখন পর্যন্ত আমার কানে পৌঁছায়নি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখতে হবে, কোন কর্মকর্তা বা আমীরকেও যদি কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হয় যেমন যদি কোন এমন বিষয় থাকে যা জামাতের নীতি পরিপন্থী বা যাতে কোন শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হয় এক্ষেত্রে শিষ্টাচারের গন্ডিতে থেকে বিনয়ের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করান। যদি এর পরও কথা না শুনেন আর জামাতের ক্ষতি হতে থাকে, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হয় সেক্ষেত্রে আমাকে অবগত করুন। নিজেদের মাঝে কোন ধরনের বাক-বিতন্ডা করার প্রয়োজন নেই। কেননা এটি আবার জামাতের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির কারণ হয়। একবার নিশ্চয় আমি বলেছিলাম, মুরুব্বীগণ ধর্মীয় বিষয়ে আমীরগণকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারেন। কিন্তু এর জন্য এই নীতির অনুসরণ করারও আবশ্যক বা এমন নৈতিকতাও অবলম্বন করা আবশ্যক যে, কোনরূপ পরিবেশ নষ্ট না করে বা জামাতের শৃঙ্খলা নষ্ট না করে উত্তম পন্থায় নসীহত করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত আহমদী হবার এবং নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

এখন জুমুআর নামাযের পর আযীযা তানিয়া খান সাহেবার গায়েবে জানাযাও পড়াবো। ইনি কানাডার উমরে খারেজা আসেফ খান সাহেবের স্ত্রী। তিনি ৬ আগষ্ট ২০১৩ সালে ৩৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ইনি লুবনানী নাঝাদ কানাডিয়ান মহিলা। ১৯৯৮ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। খুবই ভাল দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন। তবলীগের বিষয়ে বেশ আগ্রহ রাখতেন। লাজনা ইমাই-ল্লাহ কানাডার সেক্রেটারী তবলীগ ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জামাতের খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। কানাডার এমটিএ-এর নিয়মিত সদস্যা ছিলেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমেও ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কানাডায় দেশীয় পর্যায়ে ছোট বড় সফর ছাড়াও আমেরিকা সফর করেছেন। নিজের ধর্মীয় অবস্থান প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং প্রভাবশালী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করতেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষিকা ছিলেন এবং বর্তমানে কিছুদিন হলো তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের

মাঝে মানবতাবোধ তৈরি করার লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি পর্দানশীন এবং খেদমতে খালকের বিষয়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি তার অঙ্গপত্যঙ্গও দান করে দিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ ওসিয়্যত করে রেখেছিলেন। গরীবদের প্রতি সহমর্মী এবং আদর্শ স্ত্রীও ছিলেন আর আদর্শ মাও ছিলেন। প্রতিটি আত্মীয় সম্পর্ক তিনি খুবই সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন। তার বিয়ে পাকিস্তানে হয়েছে কিন্তু তিনি অসাধারণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। ইসলামী মূল্যবোধ রাখতেন, খুবই নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তা'লার ফজলে তিনি মুসিয়া ছিলেন। তার তিনটি মেয়ে সবাই ওয়াকফে নও। তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যে অঞ্চলে বা বিভাগে থাকতেন সেখানকার প্রধানও তার জানাযায় এসেছিলেন। সাংসদরাও এসেছিলেন। কাউন্সিলার মেম্বাররাও এসেছিলেন। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ অনেক অ-আহমদী তার জানাযায় এসেছিলেন। তিনি খুবই পরিচিত এবং প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোট বড় সবার কাছে আমি তার প্রসংশা শুনেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে মাগফেরাত দান করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার স্বামী এবং মেয়েদেরকেও ধৈর্য্য ও অবিচলতা এবং সহনশীলতা দান করুন।

(১৬ আগষ্ট ২০১৩, মসজিদ বাইতুল ফুতুহ, লন্ডন, ইংল্যান্ডে প্রদত্ত জুমআর খুৎবা)

তাকওয়াই সকল সফলতার মূল

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * مَالك يَوْم الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী এবং মনোনীতদের মাধ্যমে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন তাদের কিছু দায়-দায়িত্বও রয়েছে; বরং অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। আর নিজেদের দায়িত্বাবলী পালনের ফলে তাঁদের মান্যকারীরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন। এটিও আমরা ধর্মের ইতিহাস থেকে অবহিত হই, দলগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের জামাত যেসব সফলতা লাভ করে, তা লাভ করার পূর্বে বিভিন্ন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হয়। যেভাবে আমি গত পরশুর খুতবায় বলেছিলাম, ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর জামাত– যারা তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী তিন শ' বছরের অধিক সময় তারা ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং নির্যাতন ভোগ করেও স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য নবীর ইতিহাস দেখুন! প্রত্যেক নবীর জামাত এবং নবী স্বয়ং যুলুম-নির্যাতন আর বিরোধিতার যুগ পাড়ি দিয়েছেন। দলগত এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময় দীর্ঘ সময়ের কুরবানীও দিতে হয়। কিন্তু এসব কুরবানী জাতীয় স্বার্থে তেমন কোনো বিশেষ মূল্য রাখে না। ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ত্যাগের বাসনায় নিবেদিতরা, এবং যারা কুরবানী করতে থাকেন আর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারীদের নিয়তিতে পরিশেষে এসব কুরবানীর ফলে সফলতা অর্জিত হয়; আর তারা সেসব সফলতার খাতিরে নিজেদের কুরবানীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এক প্রজন্ম না হলে পরের প্রজন্ম এসব সাফল্য ভোগ করে। এজন্য ঈমানের দৃঢ়তার দাবী এটিই, ঐশী জামাত যেসব পরিস্থিতির শিকার হয় অথবা বর্তমানে জামাতে আহমদী-য়া যে পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, বিশেষভাবে পাকিস্তানে, তা দেখে বিচলিত হবেন না। আমার সামনে আপনাদের মধ্য হতে অনেকেই বসে আছেন যাদের আত্মীয়-স্বজন, যাদের প্রিয়জন পাকিস্তানে সেসব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে আর সে কারণে তারাও উদ্বিগ্ন হয়। ঐশী জামাত এবং তাদের মান্যকারীরা সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে ধর্মের উপর অবিচল থাকে। আর স্বয়ং নিজেকে সেই শিক্ষানুযায়ী সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে তাঁর নবীগণ আর বিশেষ বান্দারা আবির্ভূত হন। আজ আমি হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, কীভাবে

আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলন করতে হবে। কিভাবে আমাদেরকে বিশ্বস্ততার দাবী অনুসারে সেসব বিষয় পালন করতে হবে যার প্রত্যাশা তিনি (আ.) আমাদের কাছে করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন:-

'আমাদের অনুসারীরা যদি জামাতে পরিণত হতে চায় তাহলে একটি মৃত্যু অবলম্বন করতে হবে। রিপুর তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে বাঁচো, আর আল্লাহ্ তা'লাকে সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান কর।' হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত প্রদান করেন: হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার কারণে এবং সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশার কারণে তিনি (তাঁর দরবারে) একটি বিশেষ আসন বা মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কাজেই বিশ্বস্ততার মান যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনদের আসন লাভ করতে চাইলে এসব কুরবানী দিতে হবে এবং নিজস্ব স্বকীয়তা ভুলে যেতে হবে। সর্বপ্রথম একজন আহমদীর হৃদয়ে ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি প্রোথিত হওয়া উচিত। যখন বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়, একটি দৃঢ় সংকল্প করে, এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়, তখন বড় বড় অত্যাচারীর সামনেও তারা একটি পাহাড়ের মত দণ্ডায়মান হয়। বরং ইতিহাসে আমরা কিশোরদেরও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যে, কীভাবে তারা ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছে। দু'জন বালকই ছিল আবু জাহেলের হন্তারক, যারা একে অপরের তুলনায় এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় তার ওপর আক্রমণ করে। বর্তমান সময়ের জিহাদী অঙ্গ-সংগঠনও শিশুদের ফুঁসলিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু সেসব শিশু-কিশোর যারা প্রাথমিক যুগে কুরবানী করেছে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় তাঁর মনোনীতদের নির্দেশ পালনার্থে বিভিন্ন কুরবানী করে। তারা জাহিলদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথার ফাঁদে পড়ে অথবা শিশুকাল থেকে দীর্ঘদিন মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের পর কুরবানী করে না, যেভাবে বর্তমানে নামধারী জিহাদী অঙ্গ-সংগঠনগুলো করাচ্ছে। অনেকে হয়তো বলবে, এসব বাচ্চারাও কুরবানী করছে; কিন্তু যে কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার পরিপন্থী, যে কুরবানী এমন লোকদের প্রশিক্ষণের ফলে করা হচ্ছে– যারা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মান্য করে না আর খোদার মনোনীতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত; কাজেই সেসব কুরবানী সেই মান অর্জন করতে পারে না যা আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত জামাতের ত্যাগীরা করে থাকেন। বরং প্রকৃত কুরবানী হচ্ছে তা যা ধর্মের মূল উদ্দেশ্যকে বুঝে ত্যাগীরা করেন। প্রকৃত বিশ্বস্ততা মূলত আনুগত্যের মাধ্যমেই বোঝা যায় আর এ যুগে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের যে আনুগত্য, তা তাঁর প্রেরিতকে সন্ধান করে, তাঁর কথা অনুসারে, তাঁর শিক্ষানুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করাতেই নিহিত রয়েছে। আজ সকল নিদর্শন পূর্ণ হবার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসিহ্র উপস্থিতি এ-কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, যে জামাত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশানুসারে এ যুগের জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রতিশ্রুত মসিহ্র জামাত। আপনারা সৌভাগ্যবান, কারণ আপনারা এতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। কিন্তু যুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বিশ্বস্ততার দাবী হলো, যে আদর্শ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা দৃষ্টিপটে রাখুন। আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা এবং এর ওপর অবিচল থাকার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তা দৃষ্টিপটে রাখুন। এ যুগে যখন আমরা বলি, হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাজকে-ই সম্মুখে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এসেছেন, তাহলে আমাদের সেসব দৃষ্টান্তও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত, যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ দেখিয়েছিলেন। তাঁরা নামাযের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা ইবাদতের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় জামাতের মধ্যে এমন লোক আছেন আর যুবকদের মধ্যেও আছেন। যাদের সম্পর্কে কোনো না কোনোভাবে আমিও জানতে পারি। হাতে গোনা কয়েকজনের ব্যাপারে হয়তো জানা যায় না; কিন্তু অনেকেই আছেন যারা নিজেদের ইবাদত প্রকাশ করেন না। দিনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ এবং নফলের প্রতি তাদের মনোযোগ রয়েছে। অতএব এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমাদের যুবকদের ভেতর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কয়েকটি বা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা যেন না হয় বরং অধিকাংশই যেন এরূপ হয়। আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হচ্ছে ইবাদত। যদি এর অভ্যাস গড়ে তোলেন তাহলে সফলতা আমাদের জন্য নির্ধারিত। নামাযের ফলেই দোয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর নামাযই হচ্ছে সংশোধনের মাধ্যম, যুগের বিভিন্ন নোংরামী থেকে মুক্ত থাকার উপায়। অনেক যুবক আমাকে লিখে আবার সাক্ষাতের সময়ও বলে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। নিরাপদ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে তাদের নামায এবং ইবাদত। কেননা, খোদা তা'লার ঘোষণা রয়েছে, যে নামাযের সুরক্ষা করবে সে বিভিন্ন নোংরামী থেকে মুক্ত থাকবে। আর আল্লাহ্ তা'লার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। কাজেই নামায পড়া সত্ত্বেও যদি সংশোধন না হয়, পার্থিব বস্তু, ক্রীড়া-কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা ও অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে মন না ফিরে তাহলে নিশ্চিত যে আমাদের ভেতরেই কোনো কমতি আছে। আমাদের নামায খোদা তা'লার দরবারে সেই মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হচ্ছে যদ্বারা এসব সংশোধন হয়।

অতএব আমাদেরকে নামাযের প্রকৃত স্বাদ পাবার চেষ্টা করা উচিত। এমন স্বাদ যা আমাদেরকে খোদা তা'লার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করবে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'নামায হচ্ছে সেই জিনিস, যদি যথাযথভাবে পড়া হয় তাহলে পাঁচ দিনের ভেতর আধ্যাত্মিকতা লাভ হয়।' অতএব আমরা যদি এ মান দৃষ্টিপটে রাখি আর তা অর্জনের চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যও করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা চেষ্টা-প্রচেষ্টা আরম্ভ করলে পার্থিব এবং জাগতিক বিষয়াদির প্রতি আকর্ষণ কমবে, হৃদয়ে খোদার ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর যখন খোদা তা'লার ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে তখন আধ্যাত্মিকতার মানও সমুন্নত হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক খাদেম এবং জামাতের সদস্যদেরকে এই মান অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন।

জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেননি বরং যে আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি থেকে সঠিকভাবে লাভবান হয় না আর পার্থিব যেসব কাজ তাদের ওপর অর্পিত, যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ তাদের অধীনে আছে– যথাযথভাবে এর দেখাশোনা করে না, তাদের সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, 'যদি এসব কাজ সঠিকভাবে ও পূর্ণরূপে সম্পাদন না করা হয় তাহলে এমন মানুষও অপরাধী সাব্যস্ত হয়।' কিন্তু জাগতিক কাজকর্ম যেন ধর্মসেবার উদ্দেশ্যেই করা হয়। পার্থিবতার ওপর যেন সবদিক থেকে ধর্ম অগ্রাধিকার লাভ করে। কোনোভাবেই জগতপূজারী যেন বনে না যায়। আল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত রীতি অনুসারে যেন সকল নামায পড়া এবং ইবাদত করা হয়। যখনই এর সময় হবে তখন কাজ-কর্ম ফেলে রেখে এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

উপদেশ দিতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সকল প্রকার লৌকি-কতা থেকে তোমাদের মুক্ত থাকা উচিত। অপরিচিত যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় সে তোমাদের অবয়ব দেখে, তোমাদের আচার-আচরণ, অভ্যাস, দৃঢ়তা এবং খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি কতটা আমল করছ তা খতিয়ে দেখে। এসব যদি উত্তম না হয় তাহলে তোমাদের মাধ্যমে সে হোঁচট খাবে। কাজেই এ বিষয়গুলোকে স্মরণ রেখ।' অতএব আমাদেরকে এ বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, 'তোমাদের আচার-আচরণ কেমন তা দেখ? আচার-আচরণের একটি দীর্ঘ তালিকা আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন, কোন কাজটি ভালো এবং উন্নত মানের আর কোনটি মন্দ এবং যা হতে মুক্ত থাকতে হবে, পবিত্র কুরআন পাঠে এ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া এই আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা যাঁকে অনুকরণীয় বা সর্বোত্তম আদর্শ বানিয়েছেন তিনি হলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সনদ প্রদান করেছেন, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা আল্ কালাম: ০৫)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনদ প্রদানের পর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (সূরা আল্ আহযাব: ২২) অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে আর এই তালিকার পুরোটি এখন বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

সত্যবাদীতা এমন একটি উত্তম গুণ যে, এটি অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনেক জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। আর বলেছেন, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

অবস্থা যাই হোক না কেন মিথ্যা বলা থেকে বিরত থেকো আর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো। এছাড়া মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৩) অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। এটি হচ্ছে একজন সাধারণ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। মহানবী

(সা.)-এর নৈতিক গুণ এত উন্নতমানের ছিল যে, শত্রুরা তাঁর প্রতি সব ধরনের অপবাদ আরোপ করলেও জীবনে তিনি কখনো মিথ্যে বলেছেন এই অপবাদ দিতে পারেনি। তাঁর প্রচার বা তবলীগকে প্রতিহত করার জন্য কাফিররা বিভিন্ন শলাপরামর্শ করত, তখন কেউ বলেছিল যে, চতুর্দিকে রটিয়ে দাও যে, সে মিথ্যাবাদী। একথা শুনে তাদের মধ্য হতে একজন বলেছিল, এটি এমন একটি কথা যদি তোমরা পুরো জীবন সর্বশক্তি দিয়েও চেষ্টা কর তারপরও একথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কেননা যাদের সাথে তাঁর কোনো যোগসূত্র আছে আর যারা তাঁকে শিশুকাল থেকে চিনে তাদের মধ্যেই এই অপপ্রচার করতে চাও? তারা ভালোভাবে জানে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। আমাদের সামনে এই দৃষ্টান্তই তিনি স্থাপন করেছেন। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমাদের ভেতর এতটা সত্য আছে কি যে, অন্যরাও আমাদের সত্য বলার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। একথাও সত্য, আজ এমন মানুষও আছে যারা আহমদীয়াতের শত্রুতায় জেনে-শুনেও আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। বিশ্বের সর্বত্র আহমদীয়াতের শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বিশেষভাবে পাকিস্তানের উলামা বা মোল্লাদের হাতের ক্রীড়নক সাধারণ মুসলমানরাও প্রকৃত বিষয় জানার বা অনুধাবনের চেষ্টা না করে শোনা কথায় কান দিয়ে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করছে, ফলে তারা যে কোন ভুল কথা বলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা (আমাদের পক্ষে) এ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কোনো আহমদীর ব্যাপারে বিভিন্ন জনের মুখ থেকে বা অ-আহমদীদের মুখ থেকে এ কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দ হয় যে, তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমাদেরকে নিজেদের উত্তম চরিত্রের প্রভাব দ্বারা সবার কাছে নিজেদের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কাজের জন্য আমাদের অবস্থাকে এমনভাবে শুধরাতে হবে যাতে আমরা সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতেও মুক্ত থাকতে পারি। কেননা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মিথ্যা বা ভুল বলাও জামাতের জন্য দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে। এখানে অনেকে এমন আছেন যারা সরকারের কাছ থেকে ভাতা গ্রহণ করেন, বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকেন– এক্ষেত্রে সোজা-সরল ও স্পষ্ট কথা বলা উচিত। হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ দেখুন! তিনি নিজ মনিব ও অভিভাবকের অনুকরণে কী দেখিয়েছেন:

একবার তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মোকদ্দমা চলছিল। তাঁর (চাচাত) ভাইয়েরা মোকদ্দমা দায়ের করেছিল। বাদীপক্ষ আদালতকে বলে দিয়েছিল, এ ব্যাপারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যদি বলে দেয় যে, আমরা ভুল অথবা বিষয়টি এমন নয় তাহলে ঠিক আছে। তাঁকে সাক্ষী বানিয়েছিল আর তিনি যদি সত্য বলে দেন তাহলে অনেক বড় ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) আদালতে দৃঢ়তার সঙ্গে যা সত্য তাই বলেন। ভাই তাঁর এহেন আচরণে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য মিথ্যা বলব– এমনটি হতে পারে না। কাজেই এ ছিল সেই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আদর্শ, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আমাদের তরবিয়তের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর মনিবের যথাযথ অনুসরণ করেছেন। অতএব আমরা

যখন নিজেদেরকে তাঁর জামাতের সদস্য বলে দাবী করব তখন আমাদের এই উন্নত নৈতিক গুণও অবলম্বন করা আবশ্যক।

এরপর একটি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে, আমানত রক্ষা করা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। দায়িত্বাবলীর অঙ্গীকার পূর্ণ করা। কারো ওপর কোনো দায়িত্ব বা কাজ ন্যস্ত করা হলে তা যথাযথভাবে পালন করা। মানুষের ব্যক্তিগত আমানত রক্ষা করা, নিজের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করা। মোটকথা এরও একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর্থিক মুনাফা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা কীরূপ ছিল চলুন তা এবার দেখা যাক, এক রাখাল মুসলমান হয়ে যায় এবং সে ইহুদীদের মেষ চড়াতো। মুসলমান হওয়ার পর সে বলে, ফিরে তো যেতে পারব না; কেননা তাহলে আমি আর ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর অনুশীলন করতে পারব না। আর তারা যদি ঘুণাক্ষরেও এটি জানতে পারে তাহলে আমার প্রাণ রক্ষা দায় হবে। অথচ মেষগুলো আমার কাছে, এগুলোর কী করব? একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, মেষগুলোকে দূর্গমুখী করে ছেড়ে দাও তাহলে এরা নিজেরাই সেখানে চলে যাবে। সে-সময় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল ছিল এমনকি ক্ষুৎপিপাসায়ও জর্জরিত ছিল; কিন্তু আমানতের খিয়ানত করার কথা ভুলেও মাথায় আসে নি। কাজেই একজন নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করবে আবার খিয়ানতও করবে তা কেমন করে হতে পারে। অতএব এই নবাগত মুসলমানকে সর্বপ্রথম মহানবী (সা.) যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাহল, যথাযথভাবে আমানত রক্ষা কর। আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কর। কোনো প্রকার খিয়ানতের চিন্তাও যেন তোমাদের মনে না আসে। কাজেই আমরা যখন বলি, আমাদের জামাত ঐশী জামাত। খোদা তা'লার খাতিরে আমরা যুলুম-নির্যাতনও ভোগ করছি। উদ্বেগাকূল পরিস্থিতিও সহ্য করছি। আত্মীয়-স্বজ-নদের দুঃখ-কষ্ট দেখছি, তাহলে এ যুগের ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীতে পরিচালিত হওয়া আমাদের জন্য কীভাবে সম্ভব! আজ আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমরা কি সেভাবে আমানতের সুরক্ষা করছি? যদি করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হব, আলহামদুলিল্লাহ্। আর যদি এমনটি না করি তাহলে আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে। আমাদের এখানে অনেক এমন বিষয়ও আসে, স্বামী-স্ত্রী, বা ভাই-বোনের যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রেও অনেক সময় অসন্তোষের কারণে আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় না। পরস্পরের অধিকার হরণ করা হয়। কাজেই অনেক গভীরভাবে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

অঙ্গীকার রক্ষা করাও একটি উত্তম গুণ। খোদ্দাম এবং সকল অঙ্গ-সংগঠন বরং সম্মি-লতভাবে পুরো জামাতও এই অঙ্গীকার করে আর আজও আপনারা প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান কুরবানী করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকব। এটি নিছক বুলি সর্বস্ব কোনো সাধারণ অঙ্গীকার নয়; বরং অনেক বড় একটি অঙ্গীকার। তাই এ বিষয়ে

চিন্তা করুন। এটি অনেক বড় একটি অঙ্গীকার, যা একজন খাদেম বা জামাতের সদস্য করে থাকে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এর সাক্ষী যে, কীভাবে তিনি তা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাঁকে এই অঙ্গীকার রক্ষার সনদ প্রদান করেছেন। কিন্তু সাধারণ বিভিন্ন চুক্তি এবং অঙ্গীকারের বিষয়েও, যেক্ষেত্রে অনেক সময় এমন খুঁত বের হয় যার ফলে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি (সা.) এমনসব অঙ্গীকারও রক্ষা করতেন, যাতে কোনোরূপ আপত্তির সুযোগ না থাকে। ইসলাম গ্রহণের আগে মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু ছিল আবু সুফিয়ান। তাঁকে হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেছিল আর তিনি হিরাক্লিয়াস এর সভাসদের সামনে স্বীকার করেছিল যে, আজ পর্যন্ত তিনি (সা.) কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি। মহানবী (সা.)-এর এ ধরনের শত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কোনো দূত এসে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে ফেরত পাঠাতেন; কেননা, তুমি দূতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলে; তাই দায়িত্ব পালনের পর তোমাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানে ফিরে গিয়েও যদি বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকতে পার তাহলে বুঝে-শুনে আবার চলে এস; কিন্তু এবার এখানে থাকতে পারবে না। তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে তরবিয়ত প্রাপ্তরাও নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করতেন। ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে দু'জন যুবক এক যুবককে ধরে নিয়ে আসে আর অভিযোগ করে যে, সে আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে। হযরত উমর (রা.) তার কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে সে বলে, হ্যাঁ, এভাবে ঘটনাটি ঘটেছে আর আমার হাতেই সে নিহত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, এরা রক্তপণ নিতে প্রস্তুত নয়; তাই 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ' এর শাস্তি তুমি পাবে। সে বলল, ঠিক আছে– আমি প্রস্তুত আছি। তবে, আমার একটি নিবেদন আছে, আমার একটি ছোট ভাই আছে– এজন্য আমার পিতা আমার কাছে কিছু সোনা ও অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন। এখন সেই গচ্ছিত ধন আমাকে ওর কাছে পৌঁছাতে হবে, অথচ সে এখানে নেই বরং অন্য কোনো স্থানে আছে। আমাকে তিন দিন অবকাশ দেয়া হোক। আমি তিন দিন পর ফিরে আসব তখন আপনি যে শাস্তি দিতে চান আমাকে দিবেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে; কিন্তু এজন্য তুমি কাউকে জামিনদার নিযুক্ত কর। কে তোমার পক্ষে জামিন হবে। সে উপস্থিত লোকদের মধ্যে চারিদিকে তাকায় এবং এক ব্যক্তির ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, এই ব্যক্তি আমার জামিনদার। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবু যর গিফ্ফারী (রা.)। হযরত উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি জামিন হতে রাজি আছেন কি? তিনি বলেন, ঠিক আছে– আমি জামিন হতে রাজি আছি। সেই ব্যক্তি চলে যাবার পর তিন দিনের মাথায় আবার সব মানুষ একত্রিত হয় আর সেই দুই ভাইও চলে আসে। দিনের আলো ফুরিয়ে যেতে থাকে। এই ভেবে সবাই উদ্বিগ্ন হয় যে, এত পুরোনো এবং একজন মহান সাহাবী জামিন হয়েছেন অথচ সেই ব্যক্তি এখনও এসে পৌঁছায় নি। হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, ইনি [আবু যর গিফ্ফারী (রা.)] জামিনদার আর এই ছেলেরাও হত্যাকারীকে

ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়; তাই, তাঁকেই [আবু যর গিফ্ফারী (রা.)] শাস্তি ভোগ করতে হবে। উপস্থিত সবাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় সবাই দেখতে পায় যে, সেই [অভিযুক্ত] ব্যক্তি খুবই করুণ অবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে সেখানে পৌঁছায়। আর বলতে থাকে, আমার কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেছে, কিন্তু আমি সেই গচ্ছিত ধন ও ছোট ভাইকে বড়দের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছে শাস্তি দিন। হযরত আবু যর গিফ্ফারী (রা.) বলেন, আমি এই লোককে চিনতাম না, সে আমার প্রতি তাকালে আমি তার চেহারায় সততা দেখেছি, তাই আমি এর জামিন হয়েছিলাম। এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত সকল মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে আর [অভিযোগকারী] সেই যুবকদের উপরও এর এত বেশি প্রভাব পড়ে যে, তারা বলে, ঠিক আছে আমরা আমাদের পিতার হন্তারককে ক্ষমা করে দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) পরে তাদেরকে এ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, আমি বায়তুল মাল থেকে তোমাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারা বলে, দরকার নেই; আমরা খোদার খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অতএব এই হলো দৃষ্টান্ত এবং এই সেই মান যা সে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর আবশ্যক নয় এবং অসম্ভবও নয় যে, সেই ব্যক্তি সাহাবীই ছিলেন। হতে পারে যে, পরে বয়আত করেছেন কিন্তু সাহাবীদের মাধ্যমে তরবিয়ত প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু দেখুন! কীভাবে সে সৎসাহসের সাথে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর শাস্তি যে, প্রাণ হারানো তাও জানতেন। যাহোক, অঙ্গীকারও পূর্ণ করেছেন, অর্থাৎ আমি অঙ্গীকার করেছি তাই ফিরে আসতেই হবে। আর গচ্ছিত জিনিষ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কতটা যত্নবান ছিলেন। (ইচ্ছে করলে) সে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যও সেই সম্পদ রেখে যেতে পারতেন। সেই ব্যক্তি আমাদের এই উত্তম শিক্ষাটি দিয়ে গেছেন।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আজ আল্লাহ্‌র কৃপায়– অঙ্গীকার রক্ষা করা, আমানত রক্ষা করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানুষ হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। আর আজও এমন মানুষ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই তাদের মত হওয়া উচিত, যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণে বদ্ধপরিকর। অতএব আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পাকিস্তানে দৈনন্দিন সংঘটিত শাহাদাত ও ক্ষয়-ক্ষতি একথার সাক্ষী যে, হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার পুরো চেষ্টা তারা করছেন। তারা বলেন, আমরা অঙ্গীকার রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আমাকেও অনেকে লিখেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণার্থে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি। গত পরশু জুমুআর খুতবায় আমি পাকিস্তানের আহমদীদের বরাতে এবং বিশেষভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বরাতে যে কথা বলেছিলাম এরপর সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তানের চিঠিও আমার কাছে এসেছে; "এটি আবেগ প্রসূত কোনো কথা নয়, বরং অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি আপনাকে লিখছি, আমরা সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি।" অনুরূপভাবে সেখান-কার বিভিন্ন স্থানের জেলা কায়েদ সাহেবগণও লিখেছেন, "আমরা সদা-সর্বত্র আমাদের

অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের প্রস্তুত পাবেন। আর আপনি দেখবেন, আমরা মিথ্যা বলছি না। আমরা পিছু হটবো না।” তারা লিখেছে, “যত নির্যাতন ও নিপীড়নই করা হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ্, কেউ আমাদের দৃঢ়তা হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। কখনো এতে চির ধরতে দিব না। আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা পূর্ণ করব আর রক্ষা করব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।” অতএব, এটি সেই প্রেরণা যা জামাতের ভেতর প্রাণের সঞ্চার করে। ছোট-খাটো পদ থেকে আরম্ভ করে বড় বড় পদ পর্যন্ত সর্বত্র নিজ অঙ্গীকার রক্ষার দৃশ্য প্রদর্শন করে। কাজেই, আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করা উচিত। নিজ অঙ্গীকারসমূহ্ বাস্তবায়ন করুন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করুন। সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস অথবা জয়ধ্বনি দেয়ার মাধ্যমে নয়; বরং স্থায়ীভাবে জামাতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। পাকিস্তান হতে যেসব বিশ্বস্ততাপূর্ণ পত্র আসে তা আবেগ প্রসূত বা সাময়িক নয়। তাদের চিঠি-পত্র হতেই বোঝা যায় আর তাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড হতেও বোধগম্য হয় যে, নিশ্চিত এগুলো তাদের হৃদয়েরই ধ্বনি। তারা নিরবিচ্ছন্নভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়লো, ওখানকার দু'টি মসজিদে ২৮শে মে'র [২০১০ সাল] দুর্ঘটনা হতে যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের চিঠি-পত্রও আমার কাছে এসেছিল, আমি তা পড়ছিলাম– অবাক করার মতো প্রেরণা সেসব পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি তা থেকে কিছু কথা আপনাদের বলতে চাই যাতে আপনারাও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এসব কুরবানীকারী সম্পর্কে আপনারাও অবহিত হতে পারেন আর আপনাদের কাছে তাদের জন্য দোয়ার তাহরীক করা হয়ে যায়। লাহোরের আনসারুল্লাহ্র একজন কর্মকর্তা জনাব মজীদ বশীর তার এক পত্রে লিখেন, সেদিন জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে বাইতুন নূর মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন নির্দয়ভাবে লোকদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে, বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, ডান-বাম দিয়ে এমনভাবে গুলি ছুটেছে যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যখন আক্রমণ শুরু হয় তখন মওলানা শাদ সাহেব পবিত্র কুরআনের আয়াত, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا -এর তফসীর বর্ণনা করেন। এই তফসীর বর্ণনার পর আমদের ঈমান আরো সুদৃঢ় ও উজ্জীবিত হয় যে, অবশ্যই ভয়-ভীতির অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন আর তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন যারা আহমদীদেরকে জুমুআর নামায পড়তে বাঁধা দিয়েছে, ইনশাআল্লাহ্। এরপর লিখেন, মৃত্যুকে সামনে দেখে একটি দোয়াই মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল, হে সর্বশক্তিমান খোদা! এরা তোমার প্রিয় মসিহ্র মান্যকারী, দুর্বল কিন্তু কেবল তোমার প্রতিই বিশ্বাস রাখে, তুমি কি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? কখনো নয়। তুমি স্বয়ং সকল আহমদীর নিরাপত্তা বিধান করো। এই গরমের মধ্যে বন্দী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আল্লাহ্র কৃপায় জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে সাহায্য করেছে তা অভাবনীয়। তারা টুপিতে করে পানি এনে আহতদের পান করিয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা ভীত-সন্ত্রস্ত আর বৃদ্ধরা গরমের কারণে অতিষ্ঠ ছিল।

মোটকথা, এমন অবস্থা ছিল যা ভাষায় বর্ণনাতীত। এরপর আরো লিখেছে, হায়! আমিও যদি শাহাদতের পেয়ালা পান করে অমর হয়ে যেতাম তাহলে এমন দিন দেখতে হতো না। হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত আর মস্তিষ্ক স্থবির। কী অপরাধ ছিল এসব নিরীহ ও নিষ্পাপ আহমদীর? কেবল এতটুকুই যে, তারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে সেই মসিহ্‌র মান্যকারী এবং অনুসারী। এতই শান্তিপ্রিয় এবং অনুগত যে, আক্রমণের পর যখন মুরব্বী সাহেব ঘোষণা করেন, সবাই বসে থাকুন আর দোয়ার ওপর জোর দিন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করুন। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহীম' পাঠ করুন; তখন উপস্থিত সবাই বিনাবাক্যব্যয়ে সেখানে বসে পড়েন আর নিজেদের বক্ষে গুলিবিদ্ধ হতে থাকে। বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকেন। আর কোনো বিরতি ছাড়াই প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা যাবত এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলতে থাকে। এই ছিল সেখানকার চিত্র। ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলদের মাঝে এমন দৃশ্য দেখা যায় কি?

এরপর আরেকজন হচ্ছেন জিশান সাহেব। তিনি লিখেন, খোদ্দামরা খুবই বীরত্বের সঙ্গে দু'জন আক্রমণকারীকে ধরে ফেলে। আর একজন আক্রমনকারীকে খোদ্দামরা গুলি করে হত্যা করে। আর পুলিশরা খোদ্দামদেরকে নিজেদের বন্দুক দিতে অস্বীকার করে; কিন্তু নিজেরাও কিছু করেনি। খোদ্দামদের সাহসিকতার কারণে অধিক প্রাণহানী ঘটেনি। যদি তারা এই বীরত্ব প্রদর্শন না করতো তাহলে আরো ব্যাপক ক্ষতি হতে পারতো।

এরপর আরেকজন লিখেছেন, ২৮ মে'র দুর্ঘটনার দিন দু'সন্তানসহ আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এরমধ্যে লোকমানের বয়স বারো বছর আর গত ২৪ মে' ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে হাসানের। দু'জনই এই দুর্ঘটনার সময় পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এই দু'জন ওয়াক্‌ফে নও এর অন্তর্ভুক্ত, ওদের ধৈর্য আমার সাহস বাড়িয়েছে। খুতবা শুরু হতেই বাইরে থেকে গুলির শব্দ আসতে থাকে। পাশা পাশি মেহরাবের দিক থেকে হাত বোমা ছোড়া হতে থাকে। এমন অবস্থা দেখে আমি সন্তানদের নিয়ে পিছনের আঙ্গিনায় চলে যাই আর পানির ট্যাঙ্কের পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ি। ছেলেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওদের নিচে শুইয়ে আমি ওপর দিকে শুয়ে থাকি। এভাবে বাচ্চারা চার ঘণ্টা সময় পার করে আর অনবরত দোয়া করতে থাকে। 'রাব্বি কুল্লু শাইঈন খাদিমুকা' পড়তে থাকে। এরপর একজন সন্ত্রাসী আমার পায়ের কাছে হাত বোমা নিক্ষেপ করে। আমার ছেলে বলে, তখন সে এই দোয়া করছিল যে, হে খোদা! এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আমাদের সাহায্য করো। তুমি দয়া করো, কেননা তোমার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এরপর তিনি আরো লিখেছেন, এই সময়ের মধ্যেই সেই বোমা বিস্ফোরিত হয়; কিন্তু, সামান্য একটু আহত হওয়া ছাড়া আমরা তিনজনই প্রাণে বেঁচে যাই। এমন লোকদের ঈমান কেউ নষ্ট করতে পারে কি? যাদের সন্তানরা এরূপ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান তাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে কি যে, এরা অঙ্গীকার পালনকারী নয়?

এরপর আরেক ভদ্রলোক লোকমান সাহেব লিখেন, আমি রাবওয়ার বাসিন্দা, আর

বর্তমানে চাকরি উপলক্ষে লাহোরে বসবাস করছি। ২৮শে মে, আমিও জুমুআর নামায পড়ার জন্য মডেল টাউনের 'বাইতুন নূর' মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। যখন এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে, শত্রুরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তখন আমি মাটির নিচের ঘরে (Basement-এ) বসে খুতবা শুনছিলাম। গুলির শব্দ শুনে অধম ছুটে যাই এবং পিছনের দরজা, যা মূলত কয়েকটি হলে ঢোকার একমাত্র প্রবেশপথ, তা আগলে দাঁড়াই। একজন সন্ত্রাসী বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় যায় এবং অল্পবয়স্ক ও নিরস্ত্র তিনজন খোদ্দাম তাকে আটক করে। আর একজন সন্ত্রাসী তখন নীচতলার পুরোনো হলে আক্রমণ করে, গুলি ছোড়ে এবং হাত বোমা নিক্ষেপ করে। সে একটি জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিল এবং অনেকগুলো প্রাণ হরণ করেছিল; কিন্তু একজন খোদ্দাম ও আহতরা মিলে তাকেও জাপটে ধরে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে খোদা তা'লা অধমকে আহতদের পানি পান করানোর সুযোগ দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা মনে পড়েছে যখন একজন চরম আহত ব্যক্তি পানি পান না করে অন্যজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এই বলে যে, আমি ঠিক আছি, তোমরা অন্যদের দেখ। অন্য আহতদের অবস্থা গুরুতর ছিল। যখন এ্যাম্বুলেন্স আসে তখন তাদেরকেও শিফ্‌ট করার সুযোগ পাই। এসময় একজন খাদেম, যে আমার সাথে কাজ করছিল, তাকে যখন আমি সর্বশেষ লাশ নিয়ে যেতে বললাম তখন সে আবিষ্কার করে যে, এটি তাঁর পিতার লাশ। জুমুআর খুতবাতেও এ-বিষয়টি সংক্ষেপে বলেছি। আল্লাহ্‌র কি বিস্ময়কর লীলা, দেখুন! কত দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস তার ছিল। পিতার লাশ নিয়ে যাবার পরও সেই খাদেম মসজিদে অন্যদের কাজে সাহায্যরত থাকে।

এরপর কানাডা থেকে একজন মহিলা, নাবিলা সাহেবা লিখেছেন, আমার ভাই আলাপচারিতার সময় ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়েছেন, দারুয্ যিক্‌র (মসজিদ)-এর মূল অংশে অনেক বেশি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা হল থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনার সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে পড়ি আর আগে থেকেই সেখানে আরো ৬০-৭০ জন মানুষ ছিল। শরীর থেকে রক্তও ঝরছিল আর এত মানুষের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ মনে হল, এভাবেই যদি মরতে হয় তাহলে কিছুটা সাহায্য করে কেন মরবো না। এরপর আমরা তিনজন ছাদের দিকে দৌঁড়ে যাই আর ওপর থেকে নেমে আসার একটি পথের ওপর এই উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি যে, যদি ওপর থেকে কোনো সন্ত্রাসী নীচে নেমে আসে তাহলে আটক করবো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি, চারদিক থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং গুলি বর্ষিত হচ্ছিল। এরপর সেই সন্ত্রাসী অন্য কোনো পথ বেয়ে নিচে নেমে যায়, সম্ভবত পালিয়ে যায়। এরপর ছয় ঘণ্টা পর এই অপারেশন শেষ হয় এবং আমরা বাইরে বের হয়ে আসি। তখন পথের ওপর অনেক লাশ পড়ে ছিল। এরপর তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের পর ভাইয়ের এমবিএ'র পরীক্ষা ছিল। হাসপাতালে এসে প্রধানমন্ত্রী মিয়া শাহবাজ শরীফ ভাইকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন, আমরা এসব সন্ত্রাসীর কাছ থেকে অবশ্যই হিসাব নিব। আমার ভাই তাকে বলে, 'যে আল্লাহ্ আমাকে নবজীবন দিয়েছেন, হিসাবও তিনিই

নিবেন'। একথা শুনে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, না এভাবে বলে না, আমরা অবশ্যই তার বিচার করবো। তখন আমার ভাই আবারো বলেন: 'না স্যার, যে খোদা জীবন দিয়েছেন তিনিই আমাদের পক্ষ থেকে হিসাব নিবেন'। কাজেই, এই হল ঈমানী আত্মাভিমান এবং খোদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস।

এরপর আরেকজন বোন সৈয়দা বুশরা তৌকীর সাহেবা ঘটনার উল্লেখ করে লিখেন, যে-দৃঢ়চিত্ততা ও মহিমার সাথে আহমদীয়া জামাত প্রাণের কুরবানী দিয়েছে, এতে প্রত্যেক আহমদী আকাঙ্ক্ষা করবে, কেন আমি সেখানে যাইনি? একজন ওয়াক্‌ফে নও ছেলে সর্বদা দারুয্‌ যিক্‌র (মসজিদ)-এর বড় গেটে ডিউটি দিত। গতকাল সে নামায পড়তে আসলে ব্যবস্থাপকরা তাকে ডিউটি দেয়ার জন্য পিছনের গেটে পাঠিয়ে দেয় আর এরপরই এই অঘটন ঘটে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই যুবক ঘরে ফিরে যায়নি এজন্য যে, সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। জামাতের সদস্যদের এই প্রেরণা প্রশংসাযোগ্য। এরপর তিনি একটি রিপোর্টে লিখেছেন, একজন আহমদী বন্ধু গোলাগুলির সময় কোনোরূপ ভয়ভীতি ছাড়াই খোদার দরবারে সেজদায় পতিত হয়ে আহাজারি করতে থাকেন। একজন প্রবীণ, যার বাহু মারাত্তকভাবে আহত হয়েছিল, তিনি তা সামলে নিয়ে চরম কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সান্ত্বনা প্রদান করছিলেন। আরেকজন প্রবীণ বলেন, সবাই ব্যক্তিগতভাবে দোয়া তো করছেই, তাহলে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কেন দোয়া করছি না? দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্‌ আমাদের বিপদ দূর করে দিন। আরেকজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আহতাবস্থায় তাঁর ছেলেকে ফোন করে বলেন, বৎস! আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। তুমি সবার চেয়ে বড়, তাই তোমার মা এবং ছোট ভাই-বোনদের প্রতি খেয়াল রেখ। একজন বালক, যার বুকে গুলি লেগেছিল, চরম আহতাবস্থায় সে নিজের মা'কে ফোন করে এবং তাঁর কাছে নিজের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর সে শাহাদত বরণ করে।

সোলায়মান সাহেব লিখেন, হাতবোমা বিষ্ফোরণের কারণে চারিদিকে ধোঁয়া ছিল এবং মানুষ যত্রতত্র আহত হয়ে পড়েছিল। তখন দু'জন অথবা তিনজন আহমদী বাইরে থেকে আসেন এবং আক্রমণকারীকে আটক করতে সক্ষম হন, এবং তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। তার কাছে বিশটি হাত বোমা এবং জ্যাকেটে বিষ্ফোরক দ্রব্য ছিল। এগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এবার চিন্তা করে দেখুন! যদি সে এগুলো ব্যবহার করতে সক্ষম হত তাহলে সেখানে কত বড় ধ্বংস-যজ্ঞ হতো। এরই মধ্যে খোদ্দামগণ অন্যান্য আক্রমণকারীদেরকেও আহতাবস্থায় আটক করে। প্রায় আধা ঘণ্টা পর সেখানে পুলিশ আসে।

কাজেই, এই হল কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা খোদ্দামগণ সেখানে প্রদর্শন করেছেন। এই কয়েকটি ঘটনা আমি আপনাদের শোনালাম একথা বলার জন্য যে, বিভিন্ন ইজতেমা ও জলসা আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এবং স্বাধীনভাবে কোনো অনুষ্ঠান করার অনুমতি না থাকার পরও, সমাজে সর্বাবস্থায় শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান থাকার পরও,

মসজিদগুলোতে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে তারপরও, এবং এই ঘটনার পর মসজিদের আশঙ্কাজনক অবস্থা আরো বেড়ে গেছে। এরপরও তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের অঙ্গীকার পালনের বিষয়ে যত্নবান। যেমনটি আমি বলেছি, আপনাদের মধ্য হতে এখানে যারা বসে আছেন, হয়ত আপনাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন থেকে থাকবে যারা সরাসরি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। অনেকে হয়তো অন্য কারো ঘটনা শুনে থাকবেন। কিন্তু আপনাদের মধ্য হতে আবার অনেকে হয়তো এমনও আছেন, যারা কুরবানি করেছেন– তাদের সম্পর্কে জানেন না, অথবা তাদের ঘটনা শোনারও সুযোগ হয়নি। তাই তাদের জন্যও আমি বলে দিলাম, কীভাবে ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শনকারীরা নিজেদের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। একটি ঘটনা ঘটার কিছুকাল পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তা ভুলে যায়। কিন্তু শহীদদের শাহাদাত এবং ত্যাগীদের ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক। এর কারণ হল, যে মহান উদ্দেশ্যে তারা এই ত্যাগ করেছেন, আমাদেরকেও সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। উন্নয়নশীল জাতির পরিচয় হচ্ছে, তারা কখনো ত্যাগীদের ভুলে যায় না। তারা তাদের কথা স্মরণ রাখে এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় এবং নিজেদের ঈমান সুদৃঢ় করে। এসব ঘটনা আমাদের নিরাশ বা ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য নয়; বরং আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার কারণ হয়ে থাকে। আমাদের নিজেদেরকে কুরবানীর জন্য উপস্থাপন করা আর আমাদের ও আমাদের ঈমানকে শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। তাদের অঙ্গীকার ও ত্যাগের ঘটনাবলী স্মরণ করে আমাদের নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ন করা উচিত। নিজেদের অঙ্গীকারসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে একে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.) বলেন. “খোদা তা’লা এখন সত্যবাদীদের জামাত গঠন করছেন”। তাই আমাদের নিজেদেরকে সেসব সত্যবাদীর দলভুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর আমরা যখন নিজেদের সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবো, যখন নিজেদের সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবো এবং আমরা আমাদের ওপর অর্পিত সকল আবশ্যক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করলেই এটি সম্ভব হবে। এমনটি না করলে তিনি (আ.) সাবধানও করেছেন। অর্থাৎ, একদিকে সত্যবাদীদের জামাত গঠিত হচ্ছে। এরপর সাবধান করে বলেন, যে সত্যবাদী নয় সে আজ নয়তো কাল জামাত ছেড়ে চলে যাবে এবং এই জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যবাদীকে খোদা ধ্বংস করবেন না। কাজেই, সর্বদা স্মরণ রাখুন আর সততার বিরল দৃষ্টান্ত দেখাতে থাকুন এবং তা আমাদের দেখাতেই হবে, ইনশাআল্লাহ্। তাহলে আমরা সর্বদা খোদা তা’লার সন্তোষভাজন হতে থাকবো। তাই, আমাদের যুবকদেরও এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা চাই আর আমাদের সন্তানদেরও এ বিষয়টি সদা মানসপটে গেঁথে রাখা উচিত। আমি কিশোর ও তরুণদের দৃষ্টান্তও এখানে দিয়েছি, শত্রুর কোনো অসদাচরণ ও আক্রমণেই আমাদের ভীত হওয়া চলবে না; বরং যেসব দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিজেদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করতে হবে। কখনোই কোনো প্রকার অযথা সন্দেহে নিপতিত হওয়া

উচিত নয় যে, এই বিপদাপদ দীর্ঘায়িত হচ্ছে, জানি না পরে আরো কী হবে। বরং প্রত্যেক পরীক্ষার ফলে হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর আমাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তিনি (আ.) অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, "আমাদের অনুসারীদের ওপরও এমন এক যুগ আসবে যে, তারা উন্নতির পর উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্"। তিনি (আ.) আরো বলেন, "কিন্তু আমি জানি না এটি কি আমাদের যুগে হবে না-কি আমাদের পরে হবে?" আরো বলেন, "আমাদের অনুসারীরা ধন-সম্পদে প্রাচুর্য লাভ করবে এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই না, অবশ্যই তারা ঐশ্বর্য লাভ করবে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, যদি তারা সম্পদশালী হয়ে যায় তাহলে ঐসব লোকদের সমমনা হয়ে আবার ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন না হয়ে পরে আর জাগতিকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বসে"। অতএব, এটি আমাদের ও আপনাদের, মোটকথা আমাদের সবার জন্য একটি সুসংবাদ; হযরত মসিহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা জাগতিক ধন-সম্পদ লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু সেই পার্থিবতার পিছনে কখনো ছুটবে না যা ধর্ম হতে দূরে নিয়ে যায়। আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালন করাকে আবশ্যক জ্ঞান করো। তাঁর রসূলের আনুগত্য করাকে সর্বদা অগ্রাধিকার প্রদান করো। বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করো। ইসলামের বাণী জগতময় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইংল্যান্ডের বর্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ।

ভাষান্তরঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের,লন্ডন

আহমদী শিশু-কিশোরদের প্রতি নসিহত

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

'খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর সদর সাহেবের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আজ আমি আপনাদের সম্বোধন করছি। আমার যতটুকু মনে পড়ে, ইজতেমা উপলক্ষে আতফালুল আহমদীয়া, জার্মানীকে সম্ভবত এবারই প্রথম সরাসরি কিছু বলছি। যাহোক, আতফালুল আহমদীয়া– আহমদীয়া জামা'তের এমন একটি সংগঠন যাদের ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করে। আজকের শিশু আগামীর যুবক ও জাতির নেতা। এজন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রা.) যখন বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ শিশুদেরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন– যা 'আতফালুল আহমদীয়া' নামে পরিচিত। আতফালের মধ্যেও দু'টি ভাগ আছে: একটি ছোট আরেকটি বড়, একটি সাত থেকে দশ বা বারো বছর বয়সের শিশু-কিশোরদের, আরেকটি বারো থেকে পনের বছরের কিশোরদের। এরপর রয়েছে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

মোটকথা, আতফালুল আহমদীয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রা.) যখন বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর দৃষ্টিতেও এ বিষয়টি ছিল, জাতির এবং জামা'তের প্রত্যেক শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ যেন এতটা যোগ্যতা অর্জন করে যাতে তারা জামা'তের দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেন তারা জামা'তের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়। অনেক কিশোর, যাদের বয়স দশ-বারো বছরের চেয়ে বেশি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বুঝতে শিখেছে, কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা তারা জানে। তারা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে; আর বর্তমানে স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় আল্লাহ্র কৃপায় তা শিশু-কিশোরদের মন-মস্তিষ্ককে যথেষ্ট আলোকিত করে। অতএব, ভবিষ্যতে আপনাদেরকেই জামাতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। এখনই আপনারা আহাদনামা পাঠ করেছেন, নযম শুনেছেন যাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, 'আমরা যেমনই হই না কেন কাজ চলে যাচ্ছে; কিন্তু আপনাদের সময়ে যেন জামা'তের দুর্নাম না হয়।'

আমাদের মাঝ থেকে অনেক প্রবীণ বিদায় নিয়েছেন, বর্তমান নেতৃত্বকেও একদিন বিদায় নিতে হবে। কিন্তু, যারা উন্নয়নশীল জাতি, উন্নয়নশীল জামা'ত কখনোই এক প্রজন্মের

বিদায়ে সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না; বরং পূর্বসূরীদের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর শিশু-কিশোররা যতদিন নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বারো বা তের বছরের কিশোর অথবা দশ বছরের বালক নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না, ততদিন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কাজেই আপনারা– যারা বলতে গেলে আজ শিশু-কিশোর, কিন্তু আপনাদের চেহারাতেই আমি আগামীর নেতা দেখতে পাচ্ছি। জামা'তের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন সেসব কর্মকর্তা দেখছি, যারা পূর্বের তুলনায় জামা'তের উন্নতিকে অধিক ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ্। কাজেই, আপনারা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করুন; আর সর্বদা মনে রাখবেন, কোনো আহমদী শিশু, কোনো আহমদী কিশোর লক্ষ্যহীনভাবে জন্ম নেয় নি। তার জীবনের একটি মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদার অধম বান্দা হয়ে থাকা, যথাযথভাবে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বের দায়িত্ব পালন করা। অতএব, এখনই যদি আপনারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন তাহলে ভবিষ্যতে– জামা'তের উন্নতিতে, জামা'তের নেতৃত্বে, দেশের উন্নয়নে ও দেশের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। কাজেই এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখবেন।

সাধারণত, সন্তানরা ১০-১২ বা ১৩-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত জামা'তের সঙ্গে খুবই আন্তরিক সম্পর্ক রাখে। মজলিসের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখে। জামা'তের সভাসমূহে আসে আর নিয়মিত বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু, অনেক পিতামাতা আমাকে লিখেন, জানি না আমাদের সন্তানের কী হয়েছে? পনের বছরে পদার্পণ করেছে বা ষোল বছর হয়েছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেছে, বাইরের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে আরম্ভ করেছে; এখন না নামাযের প্রতি তাদের মনোযোগ আছে আর না মজলিসের কাজের প্রতি; আর ঘরে পিতামাতার কথা শোনার প্রতিও দৃষ্টি নেই। এক্ষেত্রে, পিতামাতার যে অপরাধ তাতো আছেই; কিন্তু সন্তানদের স্মরণ রাখা উচিত, আপনারা যদি এসব বিষয়ে চর্চা না করেন তাহলে ভবিষ্যতে জামা'তের যে নেতৃত্ব বা দায়িত্ব আসবে তা কীভাবে পালন করবেন? অতএব, দশ বা বারো বছর বয়স্ক প্রত্যেক কিশোর, যে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে– তাকে একথা স্মরণ রাখতে হবে, বিশেষভাবে যখন আপনি পনের বছরে পদার্পণ করবেন আর খোদ্দামুল আহমদীয়াতে যোগ দিবেন তখন এটি স্মরণ রাখবেন। আপনার যে পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে তা হঠাৎ করে পাল্টে যাওয়া উচিত নয়। এখনও জামাতের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখুন। পিতামাতা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে এমন সম্পর্ক রক্ষা করুন যদ্বারা আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, আর আমি অধিকাংশ সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকি।

তারা ইন্টারনেট ও টিভি অনেক বেশি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। টিভিতে যদি কার্টুন দেখতে হয় তাহলে সুস্থ মানের কার্টুন দেখুন। কার্টুন সাধারণত সুস্থ মানেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আধা ঘন্টা, এক ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা অর্থাৎ সময় নির্ধারিত থাকা উচিত। এমন যেন না হয় যে, ছুটির দিন অর্থাৎ শনি-রবিবার সকালে তারা (টিভির সামনে) বসে আর সন্ধ্যে হয়ে যায়; আর সন্ধ্যায় বসলে রাত বারোটা বেজে যায়। এমনকি মা বলতে থাকেন, বাচ্চারা এসো! খাবার খেয়ে নাও। কিন্তু, এর প্রতিও তাদের কোনো খেয়াল থাকে না। কোনো কাজের কথা বললেও বাবা-মা'র প্রতি কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অথচ টিভির সামনে বসে থেকে দেখেই যাচ্ছে। যাকে ইংরেজিতে বলে 'ক্রেজি' বা উম্মাদ হয়ে গেছে। মাথা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একই অবস্থা চলতে থাকে।

একইভাবে, আজকাল চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোররা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যদি ইন্টারনেট সম্পর্কে পিতামাতার জ্ঞান না থাকে আর কিছু ওয়েবসাইট লক করে না দেয় তাহলে অনেক সময় সন্তানরা ভুল পথে চলে যায়। এতে পিতামাতা, জামাত এবং অঙ্গ-সংগঠন চৌদ্দ-পনের বছর বয়স পর্যন্ত যে তরবীয়ত করেছেন তা সবই ভেস্তে যায়। কাজেই, সর্বদা মনে রাখবেন, জ্যেষ্ঠরা যদি আপনাদেরকে কোনো কথা বলেন তাহলে তা আপনাদের কল্যাণের জন্যই বলেন। আপনাদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই বলেন। আপনাদের ক্ষতির জন্য বলেন না। এটি মনে করবেন না, এ দেশে স্বাধীনতা আছে– আমাদের মন যা চায় আমরা তাই করব। এখন আমরা চৌদ্দ-পনের বছরের হয়ে গেছি, আমরা শিক্ষিত, আমাদের পিতামাতারা কী জানে? তাদের তো কোনো শিক্ষা-দীক্ষাই নেই। যদিও সেই প্রজন্মও এখন শেষ হবার পথে; বরং, অধিকাংশের পিতামাতা যারা বিগত আটাশ-ত্রিশ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন, তারা শিক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবপ্রজন্মের মাথায় বা যুবকরা যখন টিনএজ-এ (১৩-১৯ বছর সময়কাল-অনুবাদক) পৌঁছে তখন তাদের মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়: সম্ভবত আমরাই বুদ্ধিমান আর অন্য সবাই নির্বোধ। অথচ, ভালো কথা শুনে এতে যারা মনোযোগ দেয় না এবং প্রবীণদের হিতোপদেশ মানে না তারাই মূলত নির্বোধ। প্রবীণরা সদা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই কথা বলেন। সম্প্রতি যে গবেষণা হয়েছে তাতে এটি প্রমাণিত হয়েছে, যারা লাগাতার টিভির সামনে বসে থাকে বা ইন্টারনেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে– এর মন্দ প্রভাব শুধু চোখের উপরই পড়ে না বরং মস্তিষ্কের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। মানসিকভাবে অনেকে একেবারেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। কাজেই যদি এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে খুবই ভালো। এছাড়া, ইন্টারনেটে যদি কিছু দেখতেই হয়, তাহলে কল্যাণজনক ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানাদি দেখুন। যেমন, এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, এটি খুবই তথ্যবহুল। কিন্তু, যে-কোনো সাইটে চলে যাওয়া ঠিক নয়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের কিশোরদের কথা আমি বলছি, তাদের এমনিতেই এসব ওয়েব সাইটে যাওয়া উচিত নয়।

এছাড়া বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আরেকটি ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর তা হল, তারা বাবা-মায়ের কাছে মোবাইল কিনে দেওয়ার দাবি করে থাকে। 'দশ বছর বয়স হয়ে গেলে আমাদের হাতে মোবাইল থাকা উচিত।' যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি এমন কোন ব্যবসা বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছ যেজন্য তোমাকে প্রত্যেক মিনিটে ফোন করে সংবাদ নিতে হবে? উত্তরে বলে, আমাদেরকে বাবা-মাকে ফোন করতে হয়। যদি বাবা-মাকে ফোন করা জরুরী হয় তাহলে তারা নিজেরাই এ বিষয়টি দেখবেন। তোমার ব্যাপারে তাদের যদি কোনো মাথাব্যথা না থাকে তাহলে তোমরা কেন অযথা চিন্তা করছ? কেননা, ফোনের মাধ্যমেও বিভিন্ন বদভ্যাস সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দুষ্ট প্রকৃতির অচেনা মানুষ ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আর তাদের প্রলোভনে ছেলে-মেয়েরা প্রলুব্ধ হয়, এরা উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে নোংরা অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়, আর এর ফলে অজ্ঞাতসারে তারা বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য এই মোবাইল ফোনও অনেক ক্ষতিকর জিনিষ। এভাবে অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভুল কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাই, এথেকে বেঁচে থাকা উচিত।

পূর্বে আমি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বলেছি। এতেও কার্টুন অথবা বিভিন্ন তথ্যবহুল অনুষ্ঠানাদি দেখা উচিত। কিন্তু, অযথা ও বাজে অনুষ্ঠানাদি দেখা হতে বিরত থাকা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের অনেক পিতামাতা এখানে বসে আছেন, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা ভালো করে শুনে রাখুন। আর বড় বয়সের কিশোররা এমনিতেই ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে। কাজেই যেসব নোংরা চ্যানেল আছে তা লক করে রাখা উচিত। ইন্টারনেটের মতো টিভির চ্যানেলও লক করে রাখা যায়। এসব চ্যানেল দেখা উচিত নয়, আর ভুলক্রমে যদি হঠাৎ চলেও আসে তাহলে সাথে সাথে তা পাল্টে দেয়া উচিত। তবেই আপনারা আহমদী ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবেন। এছাড়া আপনাদের আর অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্ববাসীর সামনে একটি পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, এরা হচ্ছে আহমদী ছেলে-মেয়ে। এদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। এরা শিষ্ঠাচার ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ। যখনই সাক্ষাত হয় সালাম দেয়। সাক্ষাতের সময় বড়দের সামনে বিনয় প্রকাশ করে। বড়দের কথা শুনে। এখানে আমি দু'একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। তারা আমাকে বলেছেন, আহমদী ছেলে-মেয়েরা স্কুলে অন্য ছেলে-মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন। পড়াশুনার প্রতি অধিক মনোযোগী আর আচার-আচরণের দিক থেকেও যথেষ্ট ভালো। তাদের এ কথা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। কাজেই আপনাদের এই যে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য একে সদা ধরে রাখতে হবে। যদি ধরে না রাখেন তাহলে আহমদী হওয়া কোনই কল্যাণ বয়ে আনবে না। আপনারা হয়ত মনে করেন, কেউ আপনাদের চিনে না; কিন্তু জগদ্বাসী আপনাদের দেখেন, আপনারা কেমন– তার প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ সদা দৃষ্টি রাখেন। আর যখন তারা কারো ভালো

আচার-আচরণ দেখে, অথবা কেউ যদি পড়াশুনায় ভালো বা মেধাবী হয় এবং পড়াশুনার প্রতি যদি একাগ্রতা দেখতে পাওয়া যায়, তখন শ্রেণী-শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। আর তাদের সুদৃষ্টি আপনার জন্য উপকারী এবং আপনার পড়াশুনার উন্নতিতে সহায়ক প্রমাণিত হয়। অতএব, অধিকাংশ আহমদী ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে, একে আপনারা কখনো পরিহার করবেন না। আপন-াদের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে– স্কুলেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। আপনাদের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের কাছেও এটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় অধিকাংশ ছেলেরাও পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দেয়; কিন্তু, এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মেয়েরা এগিয়ে আছে। মনে রাখবেন! ভবিষ্যতে জামাতের বিভিন্ন দায়িত্ব ছেলেদের উপর অর্থাৎ পুরুষদের উপর বেশি অর্পিত হবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বও আপনাদের পালন করতে হবে। তাই আপনাদেরকে মেয়েদের চেয়ে পড়াশুনায় আরো অগ্রগামী হতে হবে। মেয়েরা ঘরে বসে পড়াশুনা করতে থাকে আর ছেলেরা বাইরে চলে যায়; জিজ্ঞেস করলে বলে, বাইরে যাচ্ছি; কিন্তু, জানি না কোথায় যাচ্ছি। মেয়েরা কেন এগিয়ে যাচ্ছে? কারণ, তারা ঘরে থেকে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দেয়। আর আপনারা (ছেলেরা) চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করেই মনে করেন, 'আমরা বড় হয়ে গেছি, স্বাধীন হয়ে গেছি। এখন আমরা এদিক-সেদিকে ফুটবল খেলতে চলে যাব। টিভি দেখতে মন চাইলে দেখতেই থাকব।' এমন না করে, সব কাজের জন্যই সময় নির্ধারণ করুন। স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা করা দরকার। এখানে যেহেতু ফুটবল খেলার প্রচলন আছে তাই আমি বলছি, ফুটবল খেলুন; অথবা যে খেলা আপনার পছন্দ তা অবশ্যই খেলুন। বিকেল বেলা এক বা দেড় ঘন্টা খেলাধুলা করা উচিত। স্কুলে বিরতির সময় খেলাধুলা করা উচিত। টিভিও দেখা উচিত, এতে জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু, এমন অনুষ্ঠান দেখা উচিত যা আপনার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক। কিন্তু, ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটে বসে থাকা ঠিক নয়; কেননা, এতে অনর্থক সময় নষ্ট হয়। আর যদি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে বড়দের কাছ থেকে অনুমতি নিন: 'ভালো একটি প্রোগাম এসেছে। আমরা দেখতে পারব কি?'

একইভাবে, শখ পূরণার্থে দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের হাতে মোবাইল ইত্যাদি দেয়া একেবারেই অনুচিত। পিতা-মাতার উচিত নয় সন্তানদের এমন আবদার পূর্ণ করা।

কাজেই আপনারা সর্বদা স্মরণ রাখুন! যেসব বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যদি ভারসাম্য না থাকে আর কোনো দিকে বেশি ঝুঁকে পড়া হয়, আর কোনো দিক উপেক্ষিত হলে, দু'টোই ভুল। যদি ভারসাম্য রক্ষা করেন তাহলে আপনাদের জীবন সদা ভালো কাটবে, আর বড় হয়ে আপনি একজন ভালো মানুষ হতে পারবেন। সেই মানুষ হতে পারবেন যার প্রয়োজন রয়েছে জামাতের। অতএব, আপনি একজন আহমদী সন্তান আর আপনাকে অন্যের চেয়ে ভিন্ন হতে হবে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখুন। সকল কাজের

ক্ষেত্রে আপনি অন্যের চেয়ে ভালো এটি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক আহমদী সন্তানকে স্কুলে শীর্ষস্থানে থাকতে হবে। পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। পারিবারিক সমস্যাদি বা অস্থিরতা যেন পড়াশুনার প্রতি মনোসংযোগে চির ধরাতে না পারে। আপনারা নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করতে থাকুন।

আরেকটি রোগ বা ব্যাধি, যা শৈশবে অনুভূত হয় না অথচ তামাসাচ্ছলে শৈশবেই মানুষ এ ধরনের কথা বলে থাকে; অনেক সময় বড়রাও সাবধানতা অবলম্বন করে না, বরং ছোটদের দেখাদেখি করে বসে, আর তা হলো মিথ্যা বলার ব্যাধি। ভুল কথা বলার রোগ। ঠাট্টা করে বলে, আমি এভাবে বলেছি, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি তদ্রূপ নয়। আর এভাবেই মানুষের মাঝে মিথ্যা বলার বদভ্যাস গড়ে উঠে। অতএব, তামাসাচ্ছলেও কোনো আহমদী সন্তানের মিথ্যা বলা উচিত নয়।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, পিতামাতার সম্মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতাকে সম্মান করার এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ রয়েছে, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমার প্রতিপালন করেছেন, আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এখনও করছেন। আপনাদের পিতামাতা যা উপার্জন করছেন তা আপনাদের পিছনেই ব্যয় করেছেন, আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য খরচ করেছেন, আপনাদের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচ করেছেন। তাই সন্তানের উচিত তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। দশ-এগারো বছরের বালকদের বুদ্ধি-বিবেচনার বয়স হয়ে যায়। আর চৌদ্দ-পনের বছরের তিফলের খুব ভালোভাবেই জ্ঞান থাকা উচিত: আমার প্রতি পিতামাতার এটিও একটি অনুগ্রহ, তারা আমার খরচ বহন করছেন, আমার সকল চাহিদা পূর্ণ করছেন, আমার পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন, স্কুলের বেতন ইত্যাদি দিচ্ছেন, স্কুলে যাবার পরিবহন খরচ বহন করছেন। এ কারণে আপনারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের প্রতি পিতামাতার যে অনুগ্রহ তার বিনিময় বা ঋণ তোমরা কখনোই পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু, সর্বদা তাঁদের সাথে ভালো এবং অনুগ্রহসূলভ আচরণ করা উচিত। আর সদা তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, হে আল্লাহ্! তাঁরা যেভাবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তুমিও তাঁদের প্রতি সর্বদা অনুগ্রহ করতে থাক। যদি এই দোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে আপনাদের মনে পিতামাতার জন্য সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে, আর আপনারা দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লাও এতে সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণে আপনারা আরো উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারবেন।

সাত বছর থেকে পনের বছর বয়সী ছেলেরা আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য। সাত বছর থেকে দশ বছর বয়সীদের নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে। অভ্যাস করানো উচিত আর সন্তানদেরও নামাযে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এছাড়া দশ-বারো বছরের বালকদের কিছুটা শাসন করারও নির্দেশ আছে। যদি পিতামাতা আপনাদেরকে নামায পড়তে বলেন এবং এ

ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি করেন তাহলে একে অন্যভাবে নেয়া উচিত নয়। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। এই বয়সে যদি নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যতে এই অভ্যাস স্থায়ী হবে। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, যারাই নামাযে অভ্যস্ত, যাদের পাঁচবেলা নামায পড়ার অভ্যাস রয়েছে তাদের মধ্য হতে অধিকাংশেরই শিশুকালে নামায পড়ার শখ ছিল। তারা তাদের শিশুকাল ভালো পরিবেশে কাটিয়েছেন; আর যখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন তখনও ভালো পরিবেশ পেয়েছেন। অনেকে শিশুকালে ভালো পরিবেশে বেড়ে ওঠে, জামা'তের সেবাও করে, আতফালুল আহমদীয়ার বিভিন্ন সভায়ও যোগ দেয়, মসজিদেও আসে; কিন্তু চৌদ্দ-পনের বছর হয়ে গেলে মনে করে এখন আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। এর বিপরীতে, অনেকে শৈশবে গড়ে ওঠা নামাযের অভ্যাস ধরে রাখেন। কিন্তু যারা শিশুকালে এর প্রতি মনোযোগ দেয় না তারা বড় হয়েও এ বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। একজন মুসলমানের জন্য নামায ফরয, আর পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া একান্ত আবশ্যক। কাজেই, যতটুকু সম্ভব দশ-বারো বছর বা এর চেয়ে বড় বয়সের তিফলদের পিতার সাথে নামায সেন্টারে গিয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআন পাঠ করা। অনেক শিশু আকাঙ্ক্ষা রাখে আর আমাকে দিয়ে 'আমীন'ও [শিশুরা প্রথমবার যখন সমগ্র কুরআন পাঠ সমাপ্ত করে তখন যে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে তাকে 'আমীন' বলা হয়। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন-অনুবাদক] করানো হয়। সাধারণত ছয়-সাত, আট বা নয় বছর বয়সে আমীন অনুষ্ঠান হয়ে যায়। অনেকে আবার পাঁচ বছর বয়সেই প্রথম কুরআন পাঠ শেষ করে। এ পর্যায়ে আমি যেসব পিতামাতা এখানে বসে আছেন তাদেরকে বলব, এরপর সন্তানদেরকে কুরআন পড়ানোর প্রতি আর মনোযোগ দেয়া হয় না। কাজেই, পিতামাতাও মনোযোগ দিন আর এগারো বছরের বরং নয় বছর বয়সী সন্তানরা স্বয়ং মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। যদি একবার কুরআন খতম করেন তাহলে প্রতিদিন কমপক্ষে অর্ধেক রুকূ পাঠ করুন আর কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করুন। যদি কুরআন পাঠে অভ্যস্ত হন তাহলে ধীরে ধীরে আপনারা এর মর্ম বুঝতেও সক্ষম হবেন। আর যখন কুরআন বুঝতে সক্ষম হবেন তখন একজন আহমদী মুসলমানের কী কী দায়িত্ব রয়েছে তাও জানতে পারবেন। এগুলো তাকে পালন করতে হবে যাতে সঠিকভাবে ধর্মসেবা করতে পারে আর সমাজের যে প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তাও প্রদান করতে পারে, আর আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার প্রদানেও সক্ষম হয়। রাষ্ট্রের অধিকারও প্রদান করতে পারে। জ্যেষ্ঠদের অধিকার দিতে পারে আর নিজের সঙ্গী-সাথীর অধিকার দিতেও সক্ষম হয়। অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ একান্ত আবশ্যক; আর তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরদের অনুবাদসহ কুরআন পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এখন থেকেই যদি আপনাদের মধ্যে এই উত্তম অভ্যাস সৃষ্টি হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনারা বড় হয়ে এমন মানুষে পরিণত হতে পারবেন যাদের সম্পর্কে বলা যাবে, এদের ভেতর এমনসব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে,

এখন জামা'তের উন্নতিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই উন্নতির অংশ হতে পারবে যা আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

কাজেই আপনারা সদা এসব বিষয় স্মরণ রাখুন! নামায পড়ার বিষয়ে মনোযোগী হোন। নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে যত্নবান হোন। যথারীতি পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন। স্কুলের পড়াশুনার ব্যাপারে যত্নবান হোন। জ্যেষ্ঠদের সম্মানের ব্যাপারে মনোযোগ দিন। আমি দোয়া করি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে শিখে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এগুলো মেনে চলার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর বার্ষিক ইজতেমায় আতফালদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ।

নতুন বছরে নব অঙ্গীকার

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

আজকের জুমু'আ এই নববর্ষ অর্থাৎ ২০১৫-এর প্রথম জুমু'আ। নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত বিভিন্ন মানুষের পত্র আমার কাছে আসছে, অনেকেই ফ্যাক্স করছেন। এ নববর্ষ আপনাদের জন্যও সকল অর্থেই কল্যাণকর হোক। কিন্তু একই সাথে আমি এ কথাও বলব যে, পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো তখনই আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি আমরা এটি খতিয়ে দেখি যে, গত বছর আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের যে দায়িত্ব আছে তা কতটা পালন করেছি? আর ভবিষ্যতে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আমরা কতটা করব? তো এই জুমু'আয় ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে এমন সংকল্প আমাদের করতে হবে যা আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের ভিতরে সচেতনতা, উদ্দীপনা এবং আমাদের ভিতর পরিশ্রমের মন মানসিকতা সৃষ্টি করবে। এটি স্পষ্ট যে, আহমদী হিসেবে আমাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে সে দায়িত্ব পালিত হবে নেককাজ করার মাধ্যমে। কিন্তু সে নেকি এবং পুণ্যের মানদন্ড কী হওয়া উচিত? এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া চাই যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আহমদীয়াতভুক্ত হয় এবং যে আহমদী তার জন্য এ মানদন্ড স্বয়ং হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেই মানদন্ড তা উল্লেখ করে গেছেন, এখন নতুন উপায় উপকরণ এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততপক্ষে বছরে একবার খলিফায়ে ওয়াক্তের হাতের বয়াতে সময় এ অঙ্গিকার করে যে, সে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত বা তার নির্ধারিত মানদন্ডে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর আমাদের জন্য অর্থাৎ আহমদীদের জন্য এই মানদন্ডের কথা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বয়াতের শর্তাবলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো শুধু বয়াতের দশটি শর্ত কিন্তু এতে আহমদী হিসেবে, আহমদী হওয়ার সুবাদে যে দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর উপর বর্তায় তার সংখ্যা ভাসা দৃষ্টিতেও যদি আপনি দেখেন, তা ত্রিশের অধিক দাঁড়ায়। অতএব আমরা যদি নতুন বছরের যে আনন্দ তা সত্যিকার অর্থে উদ্‌যাপন করতে চাই তাহলে এ কথাগুলো সামনে রাখা আবশ্যক, নতুবা যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়ে শুধু এ নিয়েই আনন্দিত হয়ে যায় যে, আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করলাম বা আগমনকারী ঈসা, যার আসার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাকে মেনেছি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি, কেবল এটিই যথেষ্ট নয়। এতে সন্দেহ নেই যে এটি সঠিক পথে প্রথম

পদক্ষেপ। কিন্তু হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমাদের কাছে প্রত্যাশা হল, নেকি বা পুণ্যের মাঝে অবগাহন করে, তা বুঝে তার উপর প্রতিষ্ঠিত হব এবং পাপ থেকে সেভাবে আমরা আত্মরক্ষা করব যেভাবে রক্তপিপাসু প্রাণী দেখে মানুষ নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এটি যদি হয় তাহলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনেই শুধু বিপ্লব আসবে না বরং আমরা পৃথিবীবাসীদের পরিবর্তন করা এবং তাদেরকে খোদার নিকটতর করার কারণ হব। যাই হোক এ কথাগুলোর কিছুটা বিষদ বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব রিমাইন্ডার স্বরূপ বা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে। আর স্মরণ করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বয়াতের উদ্দেশ্য বারবার আমাদের সামনে আসা উচিত।

প্রথম কথা যা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন তা হল, শিরক বা পৌত্তলিকতা বা বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে বাঁচার অঙ্গীকার। এক মোমিন যে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান রাখে এবং সেই ঈমানের কারণে খোদার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুগ ইমামের হাতে যে বয়াত করেছে এমন ব্যক্তি এবং শিরকের দূরতম সম্পর্ক থাকতে পারে না। একজন পৌত্তলিক আল্লাহ্‌র কথা মানবে এটি কীভাবে হতে পারে? কিন্তু বিষয় তা নয়। যে সূক্ষ্ম শিরকের দিকে মসিহ্ মাওউদ (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সেটি বাহ্যিক কোন শিরক বা প্রতিমাপূজা নয়। বরং তিনি সুপ্ত শিরকের কথা বলছেন যা এক মোমেনের হৃদয়কে দূর্বল করে তোলে। যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, একত্ববাদ বা তৌহিদ কেবল মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা আর হৃদয়ে সহস্র মূর্তি বা প্রতিমা লালন করার নাম নয়। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ বা ষড়যন্ত্র, প্রতারণা বা পরিকল্পনাকে খোদার সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের উপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত বা নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে ততটা গুরুত্ব দেয় যতটা আল্লাহ্‌কে দেয়া উচিত এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা পূজারী বা মূর্তি পূজারী । প্রতিমা বা মুর্তি কেবল স্বর্ণ-রূপা বা পাথর দিয়ে যে প্রতিমা বানানো হয় তাই নয় বরং প্রত্যেক বস্তু, কথা বা কর্ম যাকে খোদার মত গুরুত্ব দেয়া হয় তা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে প্রতিমা বা মূর্তি। তাই আজ আমাদের নিজ অবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে যে, গতবছর আমরা কি এসকল পরিকল্পনা বা ধূর্ততার উপর নির্ভর করেছি বা সেগুলোকে সবকিছু মনে করেছি? নাকি আমরা এগুলোকে পরিকল্পনা হিসেবে ব্যবহার করেছি আর আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়ে এসকল পরিকল্পনার মাধ্যমে খোদাতা'লার কাছে কল্যান এবং বরকতের জন্য হাত পেতেছি। ন্যায়ের বা সুবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ, আমাদের নিজেদের অঙ্গীকারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। এছাড়া তিনি এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, আমরা মিথ্যা বলব না। এমন বিবেকবান কে আছে যে বলবে যে মিথ্যা ভালো জিনিস, আমি মিথ্যা বলতে চাই?

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন, যতক্ষণ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয়, মানুষ মিথ্যা বলা পছন্দ করে না। অতএব কোন স্বার্থপরতা যদি থাকে, স্বার্থ যদি থাকে, কোন কামনা-বাসনা যদি সামনে থাকে তাহলে মানুষ মিথ্যা বলে, কিন্তু উন্নত

চারিত্রিক গুন হলো, প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান বিপদের সম্মূখীন হলেও মিথ্যা না বলা আর সত্যের আঁচল কখনো হাতছাড়া না করা। সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর পার্থক্য তখন বোঝা যায় যখন মানুষ কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিস্বার্থে হানি হওয়ার আশংকা যদি দেখা দেয় তাহলেও তা সফলতার সাথে অতিক্রম করা এবং নিজের স্বার্থকে সত্যের খাতিরে জলাঞ্জলি দেয়া। আজকাল এখানে বা ইউরোপিয়ান দেশে মানুষ এসাইলেমের জন্য আসে বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে কিন্তু আমার বারবার বোঝানোর সত্ত্বেও উকিলদের কথার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা বলে বসে, মিথ্যাভিত্তিক কাহিনী গড়ে, তারপরও অনেক সময় কেস গৃহীত হয় না বরং অনেকের কেস প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আর এখানেও আমাদের কেন্দ্রীয় টিম আছে যারা এসাইলেম বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য করে থাকে। উকিলদের কাছে তাদেরকে পাঠায় বা এমনকিছু জরুরী কথা যা তাদের কেসের জন্য গুরুত্বপূর্ন তা তাদেরকে বলে এবং তাদের পরামর্শ দেয়। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, কমিটির প্রেসিডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তির কেস প্রত্যাক্ষ্যাত হবার কারন হলো, অজস্র মিথ্যার ভিত্তিতে কেস গড়া হয়েছে, জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এটিও চিন্তা করলো না যে, মিথ্যা এবং শিরককে আল্লাহ্ তা'লা একি স্থানে একই ব্র্যাকেটে বর্ণনা করেছেন। অনেকে সুবিধার খাতিরে বা অর্থনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা কথা বলে।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মিথ্যাও একটি মুর্তি বা প্রতিমা যার উপর নির্ভরকারী আল্লাহর উপর নির্ভর বা ভরসা ছেড়ে দেয়, এ দিক থেকে আমাদেরকে আত্মঅবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে এ অঙ্গীকার করো যে, ব্যভিচার এড়িয়ে চলবে। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, ব্যভিচারের কাছেও ঘেষবে না। অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠানমালা থেকে দূরে থাক যার ফলাফল স্বরূপ এমন ধারণা হৃদয়ে দানা বাধতে পারে আর সেসকল পথ অবলম্বন কর না যার ফলে এমন পাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আজকাল টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে এমন নোংরা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় বা এগুলো খুললে যা সামনে আসে তা চোখেরও যেনা বা ব্যভিচার আর চিন্তাধারারও ব্যভিচার। আর এগুলো বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত করার কারণ হয়ে থাকে। ঘর ভাঙ্গার কারণ হয়ে থাকে। অনেক মেয়েরা বা মহিলারা স্বামীদের সম্পর্কে লিখে যে সারাদিন ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নোংরা ছবি বা চলচ্চিত্র দেখতে থাকে আর পুরুষরাও তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ করে। এর ফলশ্রুতিতে খোলা বা তালাক পর্যন্ত গড়ায়। বা এমন চলচ্চিত্র বা ফিল্মের কারণে পশুর চেয়ে হীন পর্যায়ে মানুষ গিয়ে পৌঁছে। সাধারণত আহমদী সমাজ এটি থেকে মুক্ত, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এমন ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটে না। কিন্তু এমন সমাজে বসবাস করে যদি এই নোংরামি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করা হয় তাহলে কোন পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে না। এ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষনের প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকটি অঙ্গীকার বা ওয়াদা আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো নোংরা দৃষ্টি পরিহার করব। সে কারণেই আল্লাহতালা কোরআন শরিফে গাজ্জেবাসর বা দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন যেন নোংরা দৃষ্টিপাতের আশঙ্কাই সৃষ্টি না হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন সেই চোখের জন্য অগ্নিকে হারাম করা হয়েছে যে খোদা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বা বস্তু দেখার পূর্বেই ঝুকে যায়। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে আমাদের জন্য তাগিদপূর্ণ নির্দেশ হলো নামাহরম নারীদের সৌন্দর্য্য বা তাদের সৌন্দর্য্যের স্থানগুলোকে না দেখা। লাগামহীনভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। তাই আল্লাহ তালা চান যে আমাদের চোখ বা হৃদয় যেন এই আশঙ্কা বা হুমকি থেকে মুক্ত থাকে । একারণেই তিনি এ সুমহান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য বিধিনিষেধের শর্ত মেনে চলা আবশ্যক করেছে। পর্দার নির্দেশ যেভাবে মহিলাদের দেয়া হয়েছে একই ভাবে পুরুষদেরও দেয়া হয়েছে। আর দৃষ্টি অবনত রাখার তাকিদপূর্ণ নির্দেশও একই ভাবে দেয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের ভাবা উচিত আমরা কতটা এটি মেনে চলছি।

তিনি আমাদের কাছ থেকে এটিও অঙ্গীকার নিয়েছেন যে আমরা সকল প্রকার পাপ, অনাচার, কদাচার এড়িয়ে চলব। আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এটি হলো অবাধ্যতা-অনাচার এবং কদাচারে লিপ্ত হওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন কাউকে গালি দেয়া হলো অবাধ্যতা এবং পাপাচারের নামান্তর। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন যে কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে কাফেরের পূর্বে ফাসেক বা অনাচারি অবাধ্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া উচিত। তিনি বলেন যে মুসলমানরা যখন অনাচার, কদাচার এবং পাপাচারে সীমা লঙ্ঘন করে এখন আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধের অসম্মান ও অবমাননা এবং আল্লাহ তালার নির্দেশনাবলীর প্রতি ঘৃনা তাদের ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়ার বিলাসিতায় যখন তারা মত্ত হয়েছে আল্লাহ তালা তখন তাদেরকেও একই ভাবে হালাকু এবং চেঙ্গিস খানের হাতে ধ্বংস করেছেন। আজকালও একই অবস্থা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের। আরেকটি ওয়াদা বা অঙ্গিকার যা বয়াত কারীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো সে কখনও যুলুম বা অন্যায় করবে না। যুলুম বা অন্যায় অনেক বড় একটি পাপ। অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে পদদলিত করা, কুক্ষিগত করা অনেক বড় একটি পাপ, অনেক বড় একটি যুলুম। মহানবী (সা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন অন্যায় সবচেয়ে বড়। তিনি (সা.) বলেন যে, সবচেয়ে বড় অন্যায় বা যুলুম হলো অন্যায়ভাবে নিজের ভাইয়ের সম্পত্তি হতে এক হাত বা এক বিঘত পরিমাণও কুক্ষিগত করা। তিনি বলেন, এই জমির বা ভূমির একটি কংকরও যদি সে অন্যায় ভাবে কুক্ষিগত করে তাহলে সে ভূমির নিচের সকল স্তরের বেড়ি বানিয়ে কেয়ামত দিবসে তার গলায় পড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ই জানেন নিচে কতটা স্তর রয়েছে এবং বেড়ি বানিয়ে তাতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। ভয়ের বিষয় হলো যারা মামলা মোকাদ্দমায় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষের অধিকার পদদলিত করে তাদের ভাবা উচিৎ।

এরপর আমাদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার এটি নেয়া হয়েছে যে, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। বিশ্বাসঘাতকতা না করার মানদন্ড মহানবী (সা.) যা নির্ধারণ করেছেন তা হল সেই ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করো না যারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তো এই মানে আমাদের উপনীত হতে হবে। কোন অজুহাত চলবে না যে, অমুকের আমানতে এই কারনে আমি হস্তক্ষেপ করেছি বা নষ্ট করেছি যে, সে আমার সাথে বিশ্বসঘাতকতাপূর্ণ আচরন করেছে। নিজের অধিকার আদায়ের জন্য কাযা বোর্ডের কাছে যাও বা আদালতের কাছে যাও। দ্বিতীয় পক্ষ যদি অ-আহমদী হয় তবে সরকারী আইনের আশ্রয় নাও বা জামাত বললে আদালতে যাও কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা মোমেনের মূলে কুঠারাঘাত করে। আর পরের কথা হলো সকল প্রকার ফাসাদ এবং নৈরাজ্য পরিহার কর। নিজের আপনজনদের সাথেতো কখনই নয়। আর অ-আহমদী যারা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি বলেছেন, যারা এই কারনে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যে, তোমরা খোদার প্রতিষ্ঠিত জামাতভুক্ত হয়েছ তাদের সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা এবং ফাসাদে লিপ্ত হয়ো না। নিভৃতে তাদের জন্য দোয়া কর। দেখ আমি তোমাদেরকে বারবার এই নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, সকল প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা, নৈরাজ্য এড়িয়ে চল। সব বিষয়ে ধৈর্য্য ধারন কর। দুর্ব্যবহারের বদলে সদ্ব্যবহার কর। কেউ যদি ফাসাদ বা নৈরাজ্য চায় তাহলে তোমাদের সেই স্থান থেকে চলে আসা উচিৎ। এবং মলিনতার সাথে উত্তর দাও। যখন আমি শুনি অমুক ব্যাক্তি এই জামাতভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, এই রীতি আমি পছন্দ করি না। আর যে জামাত পৃথিবীতে একটি নমুনা বা আদর্শ হবে সেই জামাত এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা তাকওয়া বিরোধী তা খোদাও পছন্দ করবেন না। আপন-পর কারো সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না। তাই আমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ভাইদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা নিজস্ব গন্ডিতে মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মসিহ্ মাওউদের (আ.) এই নসীহত বা নির্দেশকে যদি সামনে রাখা হয় তাহলে দু একটি বিষয় যা অভিযোগ হিসেবে সামনে আসে তাও আসার কথা নয়, অসাধারণভাবে এমন ঘটনা হ্রাস পাওয়ার কথা।

আর একটি অঙ্গীকার যা তিনি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন তা হলো আমরা বিদ্রোহ পরিত্যাগ করব। বিদ্রোহ তা জামাতের সামান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হোক বা সরকারী কোন কর্মকর্তার সাথেই হোক মসিহ্ মাওউদ (আ.) তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যা থেকে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ আসে। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সরকারী অন্যান্য বিষয় যা দ্বারা একজন মানুষ আইন অমান্যকারী হিসেবে পরিচিত হয় অন্যদেরকে আইনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার নামান্তর হয় এমন আচরন ইসলামী রীতিনীতির বিরোধী। এরপর তিনি বলেন, প্রবৃত্তির উত্তেজনার শিকারে পরিনত হবে না। আজকে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যা হচ্ছে তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

প্রবৃত্তির বা রিপুর তাড়নার শিকার অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ হতে পারে। এরপর ঝগড়া বিবাদ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার শিকার হয়। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করে বসে। এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় যার কারনে মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয় বা রিপুর তাড়নার শিকার হয় তা পরিহার করা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা একজন আহমদীর কাজ। তিনি বলেন যে, আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদার নির্দেশ তোমাদেরকে মানতে হবে। পাঁচ বেলার নামায সকল শর্ত সাপেক্ষে তোমরা পড়বে এই অঙ্গীকার কর। দশ বছর বয়ষ্কদের জন্য নামায আবশ্যক বা ফরয। পিতামাতার উচিৎ এক্ষেত্রে নিগরানি করা বা তত্ত্বাবধান করা, এ দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যদি পিতামাতা স্বয়ং নামাযের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হন। আমার কাছে অনেক অভিযোগ আসে, অনেক ছেলেমেয়েও লেখে যে, আমাদের পিতামাতা নামায পড়েন না বা স্ত্রীরা লিখেন যে স্বামী নামায পড়ে না। তো বাচ্চাদের সামনে এগুলো কেমন দৃষ্টান্ত হলো। পুরুষদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে পাঁচ বেলার নামায পড়ার অর্থ হলো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে হবে। অসুস্থতা বা অন্য কোন বৈধ কারণ যদি থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যদি এর উপরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই তাহলে আমাদের মসজিদ নামাযীতে ভরে যাওয়ার কথা । শুধু ওহ্দাররাই যদি এ নির্দেশ মেনে চলা আরম্ভ করে তাহলে অনেক পরিবর্তন আপনারা দেখবেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি কিন্তু এখনো অনেক শুন্যতা রয়েছে, অনেক ঘাটতি রয়েছে, আর অনেক চেষ্টা দরকার। জামাতী ব্যাবস্থাপনা এবং অঙ্গসংগঠনগুলোর এদিকে সমূহ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, যে ব্যক্তি নামায থেকে ছুটি নিতে চায় সে পশুর চেয়ে ভাল কী কাজ করেছে? তার এবং পশুর মাঝে তো কোন পার্থক্য রইলোনা। তাই প্রত্যেক আহমদীর গভীর সচেতনতার সাথে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া তিনি এ ওয়াদা এবং অঙ্গীকার নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে যে আমরা নামাযে তাহাজ্জুদও পড়বো। মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের নামাযে তাহাজ্জুদের পড়া উচিৎ কেননা অতীতের পুণ্যবানদের রীতি এটিই ছিলো। খুব সম্ভব এটি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এরই বাক্য যে, তোমাদের নামাযে তাহাজ্জুদ পড়া উচিৎ। অতীতের বুযুর্গদের বা পুণ্যবানদের এটিই রীতি ছিল এবং এটি খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এই অভ্যাস পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং পাপ নিশ্চিহ্ন করে দৈহিক ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। অতএব তাহাজ্জুদ কেবল আধ্যাত্মিক চিকিৎসা নয় বরং দৈহিক চিকিৎসাও বটে। তিনি বলেন আমাদের জামাতের উচিৎ তারা যেন অবশ্যই তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ হয়। যে বেশী পড়তে পারে না তার দুই রাকাত হলেও পড়া উচিৎ কেননা সে দোয়ার সুযোগ লাভ করবে। এ সময়কার দোয়ার একটা বিশেষ প্রভাব এবং কার্যকারিতা রয়েছে। তাই এদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের।

এরপর তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে মহানবী (সা.) এর প্রতি দরুদ প্রেরণেরও অঙ্গিকার নিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ প্রেরন করে বা দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুন বেশী রহমতবারী বর্ষণ করবেন । তাই

দরুদ শরীফের অসাধারন গুরুত্ব রয়েছে। আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দরুদ শরীফের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন যে, দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে থেমে যায়, স্থির এবং স্থবির হয়ে যায়, এর কোন অংশই উর্দ্ধলোকে যায় না যতক্ষন পর্যন্ত না তুমি তোমার নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর।

বয়আতের আর একটি অঙ্গীকার হল, রীতিমত ইস্তেগফার করবো। এক হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারে রত থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনেক বেশী ইস্তেগফার করে আল্লাহ তা'লা সকল প্রতিকুলতা থেকে তার জন্য মুক্তির পথ উন্মোচন করেন এবং সকল সমস্যার সময় তার জন্য স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করেন। আর এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দেন যা সে ভাবতেও পারে না। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন যে, কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে, যারা পাপ সম্পর্কে সচেতন আর কতক এমন আছে যারা পাপ যে করছে তা বুঝেইনা । আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের বিধান রেখেছেন অর্থাৎ সকল পাপ তা প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, সে জানুক বা না জানুক, সে যেন ইস্তেগফারে রত থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সবসময় আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকা চাই।

তিনি আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহরাজী স্মরণ রাখবে। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজীর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। খোদার এ অনুগ্রহের কথা যদি স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকে তাহলে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে নিবীড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা এবং তাঁর কথা মানার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে।

এছাড়া এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে আমি সবসময় আল্লাহ্র প্রশংসায় রত থাকব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা খোদার প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হয় তা বরকতশূণ্য এবং অকার্যকর হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বল্পে কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বেশির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে না। যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হবে না। তাই খোদার প্রশংশা এমনভাবে করুন যেন আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় আমরা আরেকটি অঙ্গিকার করেছি, আল্লাহ্র সাধারণ সৃষ্টিকেও কষ্ট দেব না। একই সাথে এ অঙ্গীকারও আমরা করেছি যে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অন্যায় কষ্ট দেব না যতটা সম্ভব মার্জনা প্রদর্শন করব। কিন্তু কারও সীমাতিরিক্ত কষ্টদায়ক ব্যবহারের কারণে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে বা রাগের বশবর্তী হয়ে নয় বরং সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয়, তাহলে ভার নিজের হাতে নিব না বরং শাসকদের অবহিত করব, শাসকদের অবহিত করবো। সংশোধন যাই হোক, যার হাতে শাসন ক্ষমতা তিনিই করবেন। প্রত্যেক জদু-মধুর কাজ নয় এটি স্বয়ং কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব না। বিনয় হওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

এ অঙ্গীকারও রয়েছে যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। সুখে, দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, কষ্টে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র আঁচল আঁকড়ে ধরবো। এক হাদীসে আছে মহানবী (সা.)

বলেছেন যে, মুমিন বড় অদ্ভুত; তাঁর সব কাজ আগা-গোড়া বরকত এবং কল্যাণই হয়ে থাকে। এই কৃপা, এই ফযল শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি কোন বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় সে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তাঁর কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্য বর্ধিত কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে। আর যদি কোন দু:খ-কষ্ট, সমস্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির সে সম্মুখীন হয় তাহলে সে ধৈর্য্য ধারণ করে। তাঁর এ আচরণও তার জন্য কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে কেননা সে ধৈর্যের দরুন পূণ্যের ভাগি হয়ে যায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়াই হলো এক মুমিনের কাজ। এটি যদি হয় তাহলে এই অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, আমরা খোদাতা'লার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কখনও কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবো না। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে আমার সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারনেও নয় আর মানুষের গালি ও দুর্ব্যবহারের জন্যও নয়। আর উর্ধ্বলোক হতে আগত পরীক্ষার কারণেও নয়। খোদাত-া'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.)-এরই হয়ে থাকব এবং এ জন্য আমরা চেষ্টা অব্যহত রাখব। যদি দু:খ এবং লাঞ্চনারও শিকার হই আমরা ভ্রুক্ষেপ করব না, এ হল আমাদের অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতি।

এছাড়া আরেকটি ওয়াদা এবং অঙ্গীকার হলো আমরা সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথার অনুসরণ করব না। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে এমন কোন কদাচারের সূচনা করে যার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই সেই কদাচার বা কুপ্রথা প্রত্যাখ্যাত এবং অগ্রহণযোগ্য। এসম্পর্কে সবসময় আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আজ কাল বিয়ে-শাদিতে বিভিন্ন আজেবাজে কদাচার ও কুপ্রথা আমরা দেখতে পাই, দেখা যায়। আহমদীদের এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত, ডানে বামে দেখে বা অন্যদের দেখে সেই সকল কুপ্রথায় আমাদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ সম্পর্কে আমি একবার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তরবিয়ত সেক্রেটারিদের এবং লাজনাদের উচিত হবে বিভিন্ন সময়ে এমন বিষয়াদি জামাতের সামনে রাখা। যেন অগ্রহণযোগ্য পরিত্যক্ত বিষয় থেকে জামাতের সদস্যরা মুক্ত থাকে।

আরেকটা অঙ্গীকার হল আমরা কামনা বাসনার অনুকরণ করব না। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলছেন, যে কেউ নিজের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে আর প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে তার নিবাস হবে জান্নাত। কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হল আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হওয়া। এর ফলে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করে মানুষ পৃথিবীতেই জান্নাতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।

এছাড়া আরেকটি অঙ্গিকার রয়েছে যে কুরআনের অনুশাসন একশত ভাগ শিরধার্য করব। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, অতএব তোমরা সাবধান থাক। আল্লাহ্র শিক্ষা এবং কুরআনের পথনির্দেশনার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নিবে না। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত নির্দেশাবলীর একটিকেও অবজ্ঞা করে সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির দরজা বন্ধ করে দেয়।

এবার আরেকটি অঙ্গীকার রয়েছে আমাদের তা হলো আল্লাহ্ তা'লা এবং তার রসূল (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশকে নিজের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আমরা অবলম্বন করব। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমাদের রসূল কেবল একজনই। আর একমাত্র কুরআনই রসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর অনুসরণ এবং আনুগত্যের কল্যাণেই আমরা খোদাকে পেতে পারি। অতএব এটি অর্জনের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া আরেকটি অঙ্গীকার রয়েছে যে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করব। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমি সত্য সত্যই বলছি যে কেয়ামত দিবসে শিরকের পর অহংকারের মত এত বড় অন্যায় বা আগুন আর নেই। এটি এমন একটি বিপদ যা উভয় জগতে মানুষকে লাঞ্ছিত করে। তাই সত্যিই ভয়ের বিষয় । তিনি আরো বলেন, আমি আমার জামাতকে নসিহত করছি যে, অহংকার পরিহার কর কেননা অহংকার প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে খুব ঘৃণ্য একটি কাজ। এছাড়া আরেকটি অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে যে বিনয় অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার জন্য বিনয় অবলম্বন করে খোদা তা'লা তার পদমর্যদা একগুণ বৃদ্ধি করবেন। আর এক পর্যায়ে এসে সে লীনদের মাঝে স্থান পাবে। বিনয় অবলম্বন করলে পদমর্যদা একগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে এমন মানুষকে স্থান দেয়া হবে। আরেকটি অঙ্গিকার বা ওয়াদা যা আমরা করেছি তা হলো সবসময় সদাচরণ হবে আমাদের বৈশিষ্ট। সবাইকে এটি সামনে রাখতে হবে। আরেকটি অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তা হলো দীনতা, বিনয় এবং সহিষ্ণুতার মাঝে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে। মসিহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, যদি খোদাকে সন্ধান করতে হয় তবে দিনহীনদের মাঝে সন্ধান কর।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) আরেকটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, ধর্ম এবং ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন, প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করব। এছাড়া এ অঙ্গিকারও নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'লার প্রেম লাভের উদ্দেশ্যে তার সৃষ্ট জীবের সেবায় সবসময় যত্নবান থাকব। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, খোদা তা'লা নেকী এবং পূণ্যকে গভীরভাবে ভালবাসেন। তিনি চান তাঁর সৃষ্টির সাথে যেন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমরা স্মরণ রাখবে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সে যেই ধর্মেরই অনুসারি হোক না কেন সহানুভূতি প্রদর্শন কর। আর বিনা ব্যতিক্রমে সবার সাথে সদ্ব্যবহার কর, নেক ব্যবহার কর। আর এটি কুরআনের শিক্ষা।

তিনি আরো অঙ্গীকার নিয়েছেন যে খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে মানব জাতির হিত সাধন করব। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে সৃষ্টির যত অভাব অনটন আছে আর আদি বন্টনকারী যেভাবে কতককে কতকের মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন এসকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ তালার খাতিরে প্রকৃত এবং নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকার সহানুভূতির প্রেরণায় তাদের হিত সাধন করা উচিত। সকল সাহায্যের মুখাপেক্ষীকে খোদা প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে

সাহায্য দেয়া উচিত। আর তাদের ইহ এবং পরকালের নিশ্চয়তার জন্য স্বীয় শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত। তাই পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সংশোধন করাও মানবজাতির হিত সাধনের অর্ন্তভুক্ত বিষয়। আর জাগতিক, আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের কল্যাণ সাধন আমাদের দায়িত্ব। অতএব বাহ্যিক সহানুভূতি এবং জাগতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, মানব জাতির খেদমত করতে হবে সেভাবে মানব জাতির কল্যাণের জন্য তবলিগের দায়িত্ব পালন করাও আহমদীদের জন্য আবশ্যক।

এছাড়া তিনি এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সাথে এমন এক সম্পর্ক আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে আনুগত্যের সীমা নাই। আনুগত্যের সেই মানে আমাদের পৌঁছতে হবে যা কোন জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় না কিংবা কোন সেবকের সেবার মাঝেও পরিলক্ষিত হয় না। সব কথার ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য করতে হবে যা তিনি আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানগত আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক তরবিয়তের জন্য লিখে গেছেন বা যা তারপর খেলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে জামাতের সদস্য পর্যন্ত পৌঁছে। এর উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের প্রতিষ্ঠা যা কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ এবং আদর্শ সম্মত। এছাড়া না আমাদের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব আর না আমাদের ঐক্য অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। তাই আমাদেরকে আত্ম জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, গত বছর আমরা আমাদের অঙ্গীকার কতটা পালন করেছি? যদি এক্ষেত্রে কোন ক্রুটি বা ঘাটতি থেকে যায় তবে এবছর আমরা কিভাবে সে ক্রুটি বা ঘাটতি পূরন করব সে বিষয়ে নজরদা-রি করতে হবে।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে সেই আমাদের জামাতভুক্ত হয় যে, আমাদের শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে। আর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য নিজের সকল চেষ্টাকে নিয়োজিত করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করুন। গত বছরের দূর্বলতাকে ক্ষমা করুন। আর এ বছর অধিক সচেতনতার সাথে আমাদের জীবনকে মসিহ্ মাওউদ (আ.) এর ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত ও রূপায়িত করার তৌফিক দিন। আজকে নামাযের পর দুজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা আমাদের শহীদ ভাইয়ের। তাঁর নাম জনাব লোকমান শেহ্যাদ সাহেব। পিতার নাম আল্লাদিতা। গুযরাওয়ালার রড়িশাহ্ রহমানের অধিবাসী। ২৭শে ডিসেম্বর ফজরের নামাযের পর তাঁকে গুলি করে শহীদ করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। লোকমান শেহ্যাদ সাহেব নিজ বংশে একাই বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ২০০৭ সনের ২৭শে নভেম্বর বয়াত করে জামাতভুক্ত হয়েছেন। বয়াতের পূর্বে শহীদ মরহুমের সে অঞ্চলের আহমদীদের সাথে অনেক বেশী উঠাবসা ছিল। রড়িশাহ্ রহমান জামাতের প্রেসিডেন্ট জানান যে জনাব সুলতান আহ্মদ সাহেবকে গ্রামের লোকজনের সাথে আলোচনা করতে দেখে এবং জামাতের সাফল্য দেখে যুক্তি-প্রমাণ শোনার পরে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা সচরাচর শুনতেন। আর বিশেষ করে আমার খুৎবা শোনা আরম্ভ করেন। আর এটিই তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়েছে। আহমদীয়াত

গ্রহনের পর ভয়াবহ বিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। বিরোধীরা আহমদীয়াত ছাড়ানোর চেষ্টায় কোন ক্রুটি করে নি। শহীদ মরহুমকে নির্মম ব্যবহার এবং হুমকি-ধমকি ছাড়াও অনেক মৌলভীর মুখোমুখি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে কোন মৌলভীই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে নি। একবার তাঁর ফুপা জোর করে তাঁকে স্থানীয় মসজিদে নিয়ে যায় যেখানে কয়েকজন মৌলভী বসে ছিল। আহমদীয়াত ছাড়ার জন্য চাপ দেয়ার পর শহীদ মরহুম বলেন যে যদি যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এরা প্রমাণ করে যে আহমদীয়া জামাত মিথ্যা তাহলে আমি আহমদীয়াত ছেড়ে দিব। মৌলভী তখন বলে যে এখন বিতর্কের সময় শেষ। এখন শুধু জামাতকে অস্বীকারের কথা ঘোষণা কর। কোন বিতর্ক হবে না। কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। শহীদ মরহুমের না মানার কারণে তাঁর ফুপা এবং সেখানে উপস্থিত মৌলভীরা তাঁকে লাঠি ইত্যাদি দিয়ে পেটানো আরম্ভ করে। এর ফলে তিনি মেরুদন্ডে ভয়াবহ আঘাত পান। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মারতে মারতে তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে তাঁর চাচার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মায়ের কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছায় চাচার খামার বাড়িতে তিনি পৌঁছান এবং ছেলেকে ফেরত দিতে বলেন। প্রথমে চাচা অস্বীকার করে তাঁর মাকে থাপ্পড় মারে যদিও তিনি আহমদী ছিলেন না। মায়ের চাপ দেয়ার পর শহীদ মরহুমকে মায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়। আর একই সাথে বলা হয় আজ থেকে তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। শহীদ মরহুমের বয়াতের এক বছর পর তাঁকে জোরজবরদস্তি সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়া হয় যেন তাঁকে আহমদীয়াত থেকে ফেরানো যায়। সৌদি আরবেও তাঁর সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে সৌদি আরব পৌঁছার পূর্বেই তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। শহীদ মরহুম সৌদি আরবেও জামাতের সন্ধান অব্যাহত রাখেন। বেশ কয়েক মাসের চেষ্টার পরে এক ভারতীয় বন্ধুর মাধ্যমে জামাতের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ মরহুম এতে গভীরভাবে আনন্দিত হন। শহীদ মরহুম সেখানে অবস্থানকালে হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিন বছর পর শহীদ মরহুম দেশে ফিরে আসেন, এসে কৃষি কাজ আরম্ভ করেন। ২০১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর রড়িশা রহমানে জামাতের বিরোধীরা খতমে নবুওত কনফারেন্স অনুষ্ঠান করে। যাতে সারা দেশ থেকে নামধারী মৌলভীরা অংশগ্রহণ করে। কনফারেন্সে মৌলভীরা জামাতের বিরুদ্ধে ওয়াজিবুল কতলের (হত্যাযোগ্য হবার) ফতোয়া দেয়। আর বিশেষ করে লোকমান শেহ্যাদ সাহেবের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদের উত্তেজিত করে। এ কনফারেন্সের পর থেকে তিনি বিরোধীদের পক্ষ থেকে অব্যাহত হুমকির সম্মুখীন ছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর ফজরের নামাযের পর তিনি যখন খামার বাড়িতে যাচ্ছিলেন বিরোধীরা তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে অর্থাৎ পথিমধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মরহুম ১৯৮৯ সনের ৫ই এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম এক উন্নত ঈমানদার, সৎ হৃদয় ও মিশুক ব্যক্তিত্বের অধিকারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ যুবক ছিলেন। জামাতে আহমদীয়া রড়িশা

রহমানের সেক্রেটারী মাল হিসেবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন। বয়াতের পর হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) এর বই গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। শহীদ মরহুম বলতেন যে আমি তখন সত্যিকার অর্থে প্রশান্তি লাভ করব যখন আমার পুরো ঘরকে জামাতভুক্ত করতে পারব। তাঁর মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশী বিরোধী মহিলা বলেন যে আমি এই ছেলের ভিতর আহমদীয়াত গ্রহণের পর এক অসাধারণ পরিবর্তন দেখেছি। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে এই ছেলে তাহাজ্জুদ আরম্ভ করে। রীতিমত রাত তিনটায় তাঁর ঘরের লাইট জ্বলে উঠত আর আমি যখন তাকে আহমদীয়াত গ্রহনের কারনে বকাঝকা করতাম শহীদ মরহুমের মাও আমার সাথে রাগান্বিত হতেন। তখন শহীদ মরহুম মাকে বলতেন, এসব কথাতো এখন আমাদের শুনতে হবে, এটি এখন আমাদের অদৃষ্ট কেননা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বিরোধীরা যাই বলুক, ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে। শহীদ মরহুম এ কথাই মাকে বলতেন অথচ মা আহমদী ছিলেন না। তিনি বলেন যে, মা! আমার কারনে এসব কথা আপনাকে শুনতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রশংসনীয় জায়গায় তাকে স্থান দিন। তার পরিবারকেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতের নূরে আলোকিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

রফিক বাট সাহেব তাঁর সম্পর্কে লিখেন, শাহাদাতের এক সপ্তাহ পূর্বে আর পুরো সময় জামাতের উন্নতি এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। তবলীগের এক উম্মাদনা ছিলো তার মাঝে। বাবুল আবওয়াব মহল্লায় এক বন্ধুর কাছে তাকে নিয়ে যাই। সেখানে বিভিন্ন রেফারেন্স এর নোটবুক দেখে তার আনন্দের সীমা ছিল না। মোবাইলে অনেক রেফারেন্স এর ছবি উঠিয়ে নেন। বলেন যে, অচিরেই ফিরে আসব। তার কাছে মূল্যবান যে ভান্ডার আছে সেটি থেকে আমি লাভবান হব। লোকমান শেহজাদ সাহেবের বিশেষ একটি দিক ছিল, প্রতিদিন হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) এর বই পুস্তক পাঠ করতেন। এই কারনে তাঁর আধ্যাত্মিকতার অসাধারণ উন্নতি হয়। তাঁর সাহচর্যে বসার পর প্রত্যেক ব্যাক্তি এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সেখান থেকে যেত।

আলমাস মাহমুদ নাসের, যিনি জামাতের মুরুব্বী তিনি লিখেন, লোকমান সাহেব সেই গ্রামের সাথে সম্পর্ক রাখেন যেখানে এই অধম জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করার পর প্রথমবার নিযুক্ত হই। লোকমান সাহেব এই অধমের কাছে দীর্ঘক্ষন বসে থাকতেন। অথচ তিনি তখনও বয়াতও করেন নি। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করার প্রক্রিয়ায় জামাতের এত কাছে এসে গিয়েছিলেন তিনি যে, আলোচনাকালে জামাতে আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে নিজেকে মনে করতেন। আহমদী এবং গয়ের আহমদীর মাঝে পার্থক্যের আলোচনায় আহমদী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। বয়াতের সময় স্বল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সাহসী যুবক ছিলেন। অনেক মার খেয়েছেন যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে। তার ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইনি আরও লিখেন যে, মসজিদে যখন তাকে লাঠি এবং রেহেল দ্বারা পিটানো হয়েছে, রেহেল যার ওপর কুরআন শরীফ রেখে পড়া হয়,

সেই রেহেল দিয়ে পিটানো হয়েছে। বন্দুকের মুখে তাকে অপহরনও করা হয়েছে। যেখানে তিনি গিয়েছেন মা তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। তখন ডাক্তাররাও কেউ ছিল না। তার এক গয়ের আহমদী বন্ধু গোপনে তাকে ফাস্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছিলেন। ইনি আরও লিখেন এই অধম যা গভীরভাবে অনুভব করেছে তা হলো লোকমান সাহেব পাহাড়ের মতো অবিচল এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল যুলুম এবং বর্বরতামূলক আচরণ সত্ত্বেও আদৌ বিচলিত ছিলেন না এবং কখনও দোদূল্যমান হননি বরং অসাধারণ মনোবল এবং ধৈর্য্য প্রদর্শন করেছেন এবং সাহাবাদের মতো দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

রানা রওফ সাহেব সৌদি আরব থেকে লিখেন, জামাতের সাথে স্থায়ী এবং রীতিমত যোগাযোগ রাখতেন কিন্তু যে ব্যক্তি ভিসা ইস্যু করতো তার কারনে চিন্তিত থাকতেন। যে ব্যক্তি ভিসা ইস্যু করত বা কফিলকে তার আত্মীয় স্বজন এবং সহকর্মীরা প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে, বলেছে যে, এই ব্যক্তি কাফের। কিন্তু কফিল বলেন, এই ব্যক্তি অবসর সময় সারাদিন কুরআন পড়ে, নামায সময়মত পড়ে। এ কেমন কাফের? অথচ তোমরা নামাযও পড় না আর কুরআনও পড় না। বিশেষ করে আয় উপার্জনের সমস্যা এবং আহমদীয়াতের কারনে আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হন। সৌদি আরবে অবস্থানকারী তাঁর গ্রামের এক আহমদী বন্ধু ইমতিয়ায সাহেব একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্পকাল পর তার নানার বাড়িতে কারো ইন্তেকাল হয়। তখন তার মামারা গয়ের আহমদী মৌলভীদেরকে একত্রিত করে এবং লোকমান আহমদকে সেখানে নিয়ে যায়। লোকমান সাহেব তাঁর পকেটে আহমদীয়া পকেট বুক রাখতেন। গয়ের আহমদী মৌলভী বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করে। তিনি যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে উত্তর দেন। পরে মৌলভীরা হৈচৈ আরম্ভ করে। তখন এক গয়ের আহমদী বুযুর্গ মৌলভীদেরকে বলেন যে, "এক ছেলে তোমাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এ অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে উত্তর দিচ্ছে। তোমরা হৈচৈ কর না। এক এক করে তার প্রশ্নের উত্তর দাও।" উত্তর থাকলে তো তারা দিবে। প্রথমবার সৌদি আরবের জলসা সালানায় অংশগ্রহন করেন। তিনি বলেন যে, স্বপ্নে এই দৃশ্য আমি পূর্বেই দেখেছি।

দ্বিতীয় জানাজা যা আমি পড়াব তা হলো শ্রদ্ধেয়া শেহজাদী সুতিয়ানুস সাহেবার। ইনি মেসিডোনিয়ার অধিবাসিনী। ২০১৪ সনের ১৯শে নভেম্বর ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ১৯৯৬ সনে স্বামীর আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েক মাস পর তিনি বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৫ সনের মার্চ এবং এপ্রিলে শরীফ দুরুস্কী সাহেব এবং শাহেদ আহমদ সাহেব জার্মানী থেকে তবলীগি সফরের দরুন সেখানে যান। যেখানে শরীফ দুরুস্কী সাহেব, মরহুমার স্বামী এবং তার আত্মীয় জনাব জাফর আহমদ সাহেবকে আহমদীয়াতের বাণী পৌছান যা তারা গ্রহন করেন। মরহুমার স্বামী বলেন, তাদের বিয়ের দশ বারো বছর হয়ে গিয়েছিল। কোন সন্তান ছিলো না। শাহেদ সাহেব হযরত খলিফাতুল মসিহ্ রাবে (রাহে.) এর কাছে তাঁর জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন। এর কিছুকাল পর আল্লাহ্ তা'লা এক সন্তান দেন। প্রথম দিকে এখানে

আহমদীরা বিরোধীতা এবং সমস্যারও সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যের সাথে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে নামায পড়তে জানতেন না। আহমদী হওয়ার পর তিনি নামায শিখেছেন। স্থানীয় লাজনার সক্রিয় সদস্যা হিসেবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। নিষ্ঠাবান আহমদী মহিলা ছিলেন। নামায সেন্টারের সাথে রীতিমত যোগাযোগ ছিল। জামাতী অনুষ্ঠানে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহন করতেন। মুবাল্লেগদের নিজ ঘরে ডাকতেন। স্থানীয় ভাষায় যে বই পুস্তক ছাপতো সেগুলো সবসময় পড়তেন। মেসিডোনিয়ায় আমাদের সেন্টার নেই। একারনে তাঁর ইন্তেকালের পর গয়ের আহমদী মসজিদে তাকে গোসল করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তারা লাশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর জানাজাও তারা পড়েছে আর আহমদীদেরকে জানাজা দেয়া হয়নি। পরে আহমদীরা গায়েবানা জানাজা পড়েছে কিন্তু যাই হোক তার স্বামী গভীর সৎ সাহস এবং মনোবল প্রদর্শন করেছেন। ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হন নি। কেননা ফিৎনা ফাসাদের আশংকা ছিলো। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং মাগফেরাত করুন আর তার সন্তান এবং স্বামীকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং তাকওয়ায় উন্নত করুন, দৃঢ় করুন। আমীন।

(২ জানুয়ারী ২০১৫, মসজিদ বাইতুল ফুতুহ, লন্ডন, ইংল্যান্ডে প্রদত্ত জুমআর খুৎবা)

“ফাস্তাবিকুল খায়রাত”- পূণ্য কর্মে অগ্রগামী হও

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

ওয়ালি কুল্লি ভিজহাতুন হুয়া মুওয়াল্লিহা ফাসতাবিকুল খায়রাত। আইনামা তাকূনূ ইয়াতি বিকুমুল্লাহু জামিয়া ইন্নাল্লাহা আনা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। (সূরা বাকারাহ-১৪৯)

আপনারা রিপোর্টেও শুনেছেন, আপনারা সকলেই জানেন তবু পৃথিবীর সকলকে জানানোর উদ্দেশ্যে আমি বলছি আল্লাহ তা’লার ফযলে আজ খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর ইজতেমা সমাপ্ত হতে যাচ্ছে আর একইভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়া ইংল্যান্ডের ইজতেমা যা এখন লাইভ ট্রান্সমিশনে আছে, সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানীর ইজতেমাও আমার এই বক্তৃতার সাথে সমাপ্ত হবে। আমি আশা করছি আল্লাহ তা’লার ফযলে আপনারা এই ইজতেমার প্রোগ্রামসমূহ থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছেন। আল্লাহ করুন এমনটিই যেন হয়। সম্ভবত এটি জার্মানীর খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় ইজতেমা যাতে আমি অংশগ্রহণ করছি। যদিও জার্মানীর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবের পক্ষ থেকে আমাদের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ডেস্কের মাধ্যমে ছোট একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম যে, আমি যেন ইজতেমায় অংশগ্রহণ করি। কিন্তু সেই আমন্ত্রণ এত দেরীতে ছিল যে তার পূর্বেই আমি এখানে আসার একটি প্রোগ্রাম তৈরী করি। যা হোক এটি হয়ত বা তার নিয়্যত ছিল, ভয়ে ভয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানান আর সেই আমন্ত্রণের সংবাদও বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে পৌঁছায় কেননা এর মাঝে তেমন কোন আগ্রহ ভরা নিমন্ত্রণ দেখা যাচ্ছিল না। যা হোক এটি সদর সাহেবের মনোবাসনা ছিল, বা হৃদয়ের প্রবল আগ্রহের সাথে প্রেরিত সংবাদই হোক না কেন। আমি যেমনটি বলেছিলাম আমি এর পূর্বেই চিন্তা করছিলাম যে এই বছরে জার্মানীর ইজতেমায় অংশ নিব। আর এই তারিখেই খোদ্দামুল আহমদীয়া ইউ.কে-র ইজতেমা হওয়ায় তাতে অংশ নিতে পারব না। যাহোক জামাতে আহমদীয়া জার্মানী সেই সব কর্মঠ জামাতের অন্তর্ভুক্ত এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াও সেই সব কর্মঠ মজলিসের অন্তর্ভুক্ত যাদের ইজতেমা সমূহে অংশগ্রহন করতে মন চায়। তাই আমি প্রোগ্রাম সেভাবে বানালাম যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ করুন জার্মানীর এই সফর এবং খোদ্দাম ও লাজনার ইজতেমা সমূহে আমার অংশগ্রহণ জার্মানীর জামাত এবং বিশেষভাবে এই দুটি অংগসংগঠন এমন কি আনসারু-

ল্লাহর জন্যও যেন কল্যাণের কারন হয়।

আল্লাহ তা'লার ফযলে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, জার্মানী জামাত এবং এর অংগসংগঠনগুলো কর্মঠ ও উদ্যমী জামাত এবং সংগঠনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত এক প্রবল প্রচেষ্টার পর এক পর্যায়ে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় বটে কিন্তু সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা অনেক বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টার দাবীদার এবং প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজও বটে এবং যে পর্যন্ত না পুরো জামাতী নেযাম এবং অংগসংগঠনগুলো এই সত্যকে বুঝে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, তারা সেই মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবে না যে পর্যায় পর্যন্ত তারা পৌঁছেছে। অতএব নিঃসন্দেহে এটি একটি আনন্দের বিষয় যে, খোদ্দমুল আহমদীয়া জার্মানী প্রথম সারির কিছু ভালো মজলিস গুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এই বিষয় আপনাদের চিন্তার কারন হওয়া উচিত যে, আপনারা কর্মঠ মজলিস সমূহের মধ্যে একটি। এজন্যও যে, আমরা যে অবস্থানে পৌঁছেছি তা থেকে যেন পতিত না হই। আর এ জন্যও যে, মোমেনের এবং উন্নয়নশীল জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো তাদের পদক্ষেপ সামনের দিকে অগ্রসর হয় ঐশী জামাতসমূহের অগ্রগামী হবার লক্ষ্যে মূল বিষয়সমূহ পৃথক, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ যেসব ভিন্ন, সেসব তারা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখেন। ঐশী জামাতসমূহ এবং এর অনুসারীরা দুনিয়ার মান সম্মান এবং ধন দৌলতকে অগ্রগণ্য মনে করে না। যদিও আল্লাহর আদেশের অধীনে সেগুলোও লাভ করে থাকে এবং করাও উচিত যেন একে ধর্মের অধিনস্ত করে ধর্মের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'ফাস্তাবিকুল খায়রাত' অর্থাৎ পূণ্য কর্মে অগ্রসর হও (বাকারাহ -১৪৯) এই ঐশী আদেশ তাদের দৃষ্টিপটে থাকে এবং থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে এটি বর্ণনা করেছেন। এই আয়াতে যা আমি তেলাওয়াত করেছি, এখানে বলেছেন, যার অর্থ হলো, "প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি লক্ষ্য, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং তোমরা পূণ্য কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

সুতরাং এটি সেই লক্ষস্থল যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। দুনিয়াতে উন্নতি তখনই সাধিত হয় যখন কোন লক্ষ্য সামনে থাকে। যদি লক্ষ্য না থাকে, তবে উন্নতিও হয় না। বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন নতুন আবিস্কার এই জন্যই হচ্ছে যে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়। প্রথমে একটি ধারণা দাড় করানো হয় তারপর সেই ধারণা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। অতপর সেই গবেষণার জন্য, সেই ধারণা পর্যন্ত পৌছানোর জন্য অর্থ ব্যয় হয়, রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তহবিল তৈরি করা হয়, বছরের পর বছর পরিশ্রম করা হয়, অবশেষে একটি নতুন আবিস্কার পাওয়া যায় আর গবেষণার জন্য যে খরচ হয় তা এত বেশী হয় যে, বানিজ্যিক কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালিত কোন গবেষণা যদি এক সময় বাণিজ্যিকীকরন করা না হয় তবে সে সমস্ত কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু এমন

অনেক গবেষণা হয় যার উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়ার কল্যাণ সাধন। আর এর জন্য রাষ্ট্র অনেক বড় বড় বাজেট রেখে থাকে। কিছু গবেষণা মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য হয়ে থাকে। আর কিছু গবেষণা অহেতুক বরং উল্টা ক্ষতির কারণ হয়। আহমদী শিক্ষার্থীদের যখন আমি গবেষণা ক্ষেত্রে যেতে বলি, এর একটি কারন হলো একজন আহমদীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত আর এটি হওয়া খুবই জরুরী। আরেকটি কারন হলো মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। আবার আরেকটি কারন হলো, দেশের উন্নতিকল্পে একজন আহমদীর নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। আর এ জন্যও যে, জামাতের সদস্য হওয়ার কারনে একজন আহমদীর নিজ অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত যে, আমি একজন আহমদী, আমার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, আমার একটি সম্মান ও মর্যাদা আছে। দুনিয়ার যে প্রান্তেই একজন আহমদী বসবাস করুন না কেন তার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় থাকা উচিত। আর আজকাল বরং সর্বদাই জ্ঞান একটি অনেক বড় সম্পদ যার মাধ্যমে মানুষের স্বকীয়তা ফুটে উঠে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছিলাম কিছু গবেষণা অহেতুক হয়ে থাকে। একজন মোমেনকে এ থেকে বেঁচে চলা উচিত। এমন কি এসবের বিরুদ্ধে দলীল প্রমান উপস্থাপন করে এগুলো বন্ধ করা উচিত। আমাদের যুবকরা যদি শিক্ষিত না হন, গবেষণার সাথে জড়িত না থাকেন, তবে এসব নতুন আবিস্কারের ভালো-মন্দ কিভাবে তুলে ধরবেন? ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে দুনিয়া আজ সামনে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে সাথে কিছু বেহুদা কার্যকলাপও সংগঠিত হচ্ছে, অহেতুক বা ধর্ম বহির্ভূত কার্যকলাপ ও কথা বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে যার ফলে নতুন প্রজন্মের এবং জাতির চরিত্র বিনষ্ট হচ্ছে। অনুরূপভাবে বায়োলজিতে ক্লোনিং এর গবেষণা, এটিও আল্লাহ তা'লার সৃষ্টি জীব বা সৃষ্টির মধ্যে হস্তক্ষেপ করার শামিল। এই গবেষণা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, এই যে পরিবর্তন তোমরা সৃষ্ট জীবের মধ্যে করার চেষ্টায় রত আছ। এই কার্য পরিশেষে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিপতিত করার কারন হয়ে দাড়াবে। সুতরাং আহমদীদের গবেষণা বা কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা সেই কাজের জন্য হবে এবং হওয়া উচিত যা পূণ্যকর্মে অগ্রসর করবে। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে। জ্ঞান নিঃসন্দেহে অনেক বড় সম্পদ, এর জন্য পরিশ্রম করা উচিত কিন্তু একজন আহমদীর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং জ্ঞানকে এর (আল্লাহর সন্তুষ্টি) অধিনস্ত করা।

নিঃসন্দেহে এই বাহ্যিক গবেষণা এবং বাহ্যিক জ্ঞানে উন্নতি সাধন করাও আমাদের 'মাতমায়ে নযর' (লক্ষ্যবস্তু বা উদ্দেশ্য) এবং এটি এই ধ্যান ধারনার সাথে যে, একে ধর্মের অধীনে এনে ধর্ম এবং মানব জাতির জন্য কার্যকর এবং উপকারী করা। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন, একজন মোমেনের কাজ হলো সকল প্রকার পূণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়া। একজন আহমদী যুবক বা ব্যক্তি যদি তার জাগতিক এমন জ্ঞান এবং গবেষনায় অনেক উন্নতি সাধন করে যা মানবজাতির জন্য উপকারী এবং কার্যকরও বটে কিন্তু যদি তার খোদা

তা'লার অধিকার আদায়ের ঘর শূন্য থাকে তবে সে "ফাস্তাবিকুল খায়রাত" (সূরা বাকারাহ- ১৪৯) এর উপর আমলকারী নয় বলে সাব্যস্ত হবে। যদি সে তার জ্ঞানের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায় কিন্তু বান্দার অধিকার আদায়কারী না হয় তবে "ফাস্তাবিকুল খায়রাত " (সূরা বাকারাহ-১৪৯) এর উপর আমলকারী নয় বলে গণ্য হবে। অতএব আমাদের সে সকল বিষয়ের অন্বেষন করা উচিত যেগুলোকে আল্লাহ তা'লা খায়রাত (উত্তমসমূহ) এবং পূণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা আমাদের দাবী হলো, আমরা এ যুগের ইমামকে মান্য করে সকল প্রকার পূণ্য কর্মে অগ্রগামী হব এবং যে উন্নতি বা সফলতা খোদা তা'লা এবং তাঁর বান্দার অধিকার আদায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যে সফলতা আমাদের ধর্মের অধিকার আদায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা উন্নতি বা সফলতা নয় বরং তা জাহালত (অজ্ঞতার)-এর নামান্তর। ধর্ম এবং খোদাতা'লার ইবাদতের অধিকার আদায়ের সম্পর্কে আমি সাদামাটা উদাহরন উপস্থাপন করছি। ঈদ এমন একটি ইসলামী উৎসব যেটিতে চরম নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অংশগ্রহন করা জরুরী। কিন্তু এমনটি দেখা যায় যে, কিছু ছাত্র তার বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল, কলেজের ক্লাসের অজুহাত দেখিয়ে এতে অংশগ্রহন করে না, অথচ নিজ প্রয়োজনের খাতিরে দেখা যায় দিনের পর দিন ছুটি কাটায়। যেহেতু কয়েকদিন পূর্বে ঈদ অতিবাহিত হয়েছে তাই আমার নিকট এই উদাহরন উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু ছেলেকে আমি চিনি তারা অপারগতার অজুহাত প্রদর্শন করেছে অথচ তারা যদি পূর্ব পরিকল্পনা করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা স্কুলকে অবগত করত তবে ছুটি পেয়ে যেত।

যাহোক আমার বলার উদ্দেশ্য হলো আপনারা যারা এই পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করছেন যেখানে ধর্মের প্রতি অনুরাগের গুরুত্ব খুবই সামান্য। আপনারা যারা আহমদী, এই দাবী করে থাকেন যে, আমরা সেই ইমামের অনুসারী যিনি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার চেতনা আমাদের মাঝে ফুঁকে দিয়েছেন এবং আমরা আমাদের প্রত্যেক ইজতেমা ও সভায় এই প্রতিজ্ঞা পুনরাবৃত্তি করি যে আমরা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব, যদি আপন-ারা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখান, তবে এটি সে সমস্ত পূণ্য কার্যসমূহে অগ্রসর হওয়ার বিপরীত যেগুলোর দিকে খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদের আহ্বান করে থাকেন। যেরূপ আমি বলেছি, একান্ত অপারগতার সময় ফরয বিষয়গুলোও এদিক ওদিক হয়ে যায় এবং নফলও পরিত্যাগ করা যায়। যেমন, পরীক্ষা ইত্যাদি সময় ছাত্ররা বাধ্য হয় কিন্তু কেবল ক্লাসের জন্য, কেবল নিজের ব্যবসার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, কেবল নিজের পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ধর্মকে পিছনে নিক্ষেপ করা আর পার্থিবতাকে অগ্রে রাখা, এটি প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করার বিপরীত কাজ।

সুতরাং প্রকৃত বিষয় হলো আমরা যারা আহমদী হওয়ার দাবী করি, হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এই আহমদী নাম এ জন্য রেখেছিলেন যেন পৃথিবীবাসী জানতে পারে আহমদীরা যুগ ইমামকে মান্যকারী মুসলমান এবং যুগ ইমামের আনুগত্য স্বীকার করে অন্যদের থেকে

এজন্য আলাদা যে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র "ফাস্তাবিকুল খায়রাত' (সূরা বাকারাহ, ১৪৯) পূণ্য কর্মে অগ্রগামী হওয়া। আজকে এই নামের সম্মান ও মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে, এটি আমাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খিত মান অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। প্রচেষ্টার অর্থ এই নয় যে, আলস্য প্রদর্শন করব আর বলব আমরা চেষ্টা করেছিলাম এবং চেষ্টা করছি। বরং এর অর্থ হলো, নিজের সমস্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে পূণ্য অর্জনের চেষ্টা করা। সে উদ্দেশ্য অর্জনের এবং হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর নামের সম্মানের খাতিরে নিজেকে আত্মত্যাগের চরম সীমায় উপনীত করতে হবে। তারপর বিষয়বস্তু খোদার হাতে ছেড়ে দিতে হবে, এই হলো চেষ্টা করা। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের জামাতের সদস্যদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যে ব্যক্তি আমাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত থেকে মন্দ আদর্শ বা নমুনা প্রদর্শন করে, কর্মে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে দূর্বলতা প্রদর্শন করে সে যালেম বা অত্যাচারী। কেননা সে সমস্ত জামাতের বদনাম করে আর আমাকেও আপত্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "সুতরাং নিজ অবস্থার দৈনন্দিন হিসাব নিকাশের খাতা (ডায়েরী) তৈরি করা উচিত এবং এতে গভীর মনোনিবেশ করা উচিত যে পুণ্য কর্মে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে? মানুষের আজ এবং কাল এক হওয়া উচিত নয়। পুণ্যকর্মের উন্নতির দিক থেকে যার আজ এবং কাল সমান সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "খোদা তা'লার সাহায্যের ভাগীদার তারাই হয় যারা সর্বদা পূণ্যকর্মে অগ্রসরমান, এক স্থানে স্থির থাকে না।" তিনি (আ.) বলেন, "স্থির পানি পরিশেষে নোংরা হয়ে যায়।"

সুতরাং আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য যেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেছেন তা হলো, পূণ্যকর্মে অগ্রসর হও, এক স্থানে স্থির হয়ে যেও না, এর উপর স্থির চিত্ত হয়ো না যে, আমরা অনেক নেক কাজ করে ফেলেছি। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, এটিই অনেক বড় পূণ্যের কাজ! না, বরং সকল প্রকার নেক কাজে অগ্রসর হতে হবে। এক স্থানে স্থির হয়ে যাওয়া এবং নেক কাজে উন্নতি সাধন না করতে থাকা ব্যক্তিদের হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) স্থির পানির সাথে তুলনা করেছেন। প্রবাহমান পানি সর্বদা স্বচ্ছ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা আবর্জনা ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু স্থির পানি ধীরে ধীরে দূর্গন্ধময় হয়ে যায়। মনুষ্য প্রকৃতিতেও এটি পাওয়া যায় যে যদি তার মনে এই অনুভূতি না থাকে যে তার নেককার্যগুলোকে সবসময় যাচাই করতে থাকবে, পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে যে, সে একই জায়গায় স্থির তো নয়। যদি স্থির থাকে তবে এটি খুবই ভয়ানক বিষয়, চিন্তার কারণ। শত শত চোর, ডাকাত, শয়তান তার পিছু ধাওয়া করছে যারা তাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দিবে, আর মানুষ স্থির পানির মত হয়ে যাবে যা কিছুকাল পরে দূর্গন্ধময় হয়ে যায়, ক্ষতিকর হয়ে যায়।

খোদ্দামুল আহমদীয়া জামাত আহমদীয়ার সেই দল যারা স্বেচ্ছায় এই সংগঠনের সাথে

নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। যারা আহমদীয়াতের খোদ্দাম, যারা এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব আর এর জন্য নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং মান-সম্মান কুরবানী করব। খেলাফতে আহমদীয়াকে সমুন্নত রাখতে সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। যুগ খলিফার সকল আদেশ যা মারুফ বা স্পষ্ট, যা "ফাস্তাবিকুল খায়রাত" (সূরা বাকারাহ ১৪৯) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে তা পালনের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিব। আপনারা আপনাদের প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি দিন। আল্লাহ তা'লা এটি জিজ্ঞাসা করবেন না যে, কত ইউরো বা কত পাউন্ড আয় করেছ? খোদা তা'লা এটি জিজ্ঞাসা করবেন না যে তুমি কতটুকু দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করেছ? খোদা তা'লা এটি জিজ্ঞাসা করবেন না, তুমি তোমার জাগতিক উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছ? হ্যাঁ, আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করব তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে নিজ পূর্ণ-সামার্থ্য দ্বারা কতটুকু চেষ্টা করেছ? তুমি আমার আদেশাবলী কতটুকু পালন করেছ? যদি করে থাক তবে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আস! আমার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ কর। সুতরাং এটি হল সেই মহান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যা আমাদের প্রত্যেককে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পরিচালিত করেছেন এবং 'পূণ্য কর্মে অগ্রসহ হও' এই আদেশ কেবল ব্যক্তি পর্যায়ের উপকার বা কল্যাণ লাভের জন্যই নয়, বরং এই আদেশ দিয়ে জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাতীয় এবং জামাতী উন্নতিরও এমন এক মূলমন্ত্র বর্ননা করা হয়েছে যে, যার উপর আমল করে আমাদের জামাতী উন্নতির গতিও হাজার গুণ বৃদ্ধি হতে পারে আর সেই সাথে জাতীয় উন্নতির গতিও হাজার গুণ বৃদ্ধি হতে পারে। রসূল করীম (সা.) এর সাহাবীদের উন্নতির রহস্যও এটিই ছিল যে, তাঁরা এটি দেখেননি যে অমুক ব্যক্তির মাঝে কি দূর্বলতা বা মন্দ অভ্যাস আছে বরং এটি দেখেছেন যে, অমুক ব্যক্তির মাঝে কি ভাল গুণ এবং নেকী আছে, আর তার চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদি ইবাদতকারী হন তবে প্রত্যেকে তাতে অগ্রগামী হবার চেষ্টা করেছেন, যদি অন্য কোন পূণ্য কর্ম পরিলক্ষিত হতো তবে সকলে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যেতেন।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে ঘটনা বর্ণিত আছে একদা অনেক সম্পদ তার হস্তগত হলে তিনি তা থেকে অর্ধেক নিয়ে আসেন যে আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.) কে পরাজিত করব। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর (রা.) ধন-সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। আঁ-হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, ঘরে কি কিছু রেখে এসেছ? আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) কে রেখে এসেছি। ঘরের সবকিছু নিয়ে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি অর্ধেক নিয়ে এসে বড়ই গর্বিত ছিলাম, আমি কখনই হযরত আবু বকরের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবো না। সুতরাং অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতার এই স্পৃহা তাদের মাঝে ছিল। সাহাবাদের (রা.) চোখ দিয়ে পানি ঝরত যে, হায়! আজ আমাদের

কাছেও যদি সম্পদ থাকত, ঘোড়া থাকত, অস্ত্র-সস্ত্র থাকত তবে আমরাও জিহাদে অংশ নিতে পারতাম। সদকা-খয়রাতে অগ্রগামী লোকেরা ছিল, তাদের দেখে গরীবদের মনে উদয় হল, তারা তো আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা আঁ হযরত (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, তারা তো অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার পাঠ কর তবে তোমাদের সদকা-খায়রাত করার এই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে ধনী ব্যক্তিরাও এগুলো পাঠ করা শুরু করে। সুতরাং প্রত্যেকের মাঝে প্রত্যেকের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা ছিল, পূণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার চেতনা ছিল। এই প্রেরণা এবং চেতনায় বলীয়ান হয়ে পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়ণ করেন। সেই যুগে বাচ্চারা এবং যুবকরা এটি ভাবতো না যে ইবাদত করা এবং পূণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়া বয়স্কদের কাজ। বরং যুবক সাহাবারাও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন এবং আঁ হযরত (সা.) এর সাথে সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছেন। আর নিজ অবস্থানকে উন্নীত করেছেন। এমনকি শুরুতে আঁ-হযরত (সা.)-কে মান্যকারীদের মাঝে যুবকদের সংখ্যাই বেশি ছিল। যারা পূণ্যকর্মে অগ্রগামী হয়ে ইসলামের পক্ষে সীসাগলিত দেয়ালের ভূমিকা রেখেছিল। আজ মুহাম্মদী মসিহ, যিনি আখেরীনদের মাঝে হওয়া স্বত্ত্বেও আওয়ালীনদের সাথে মিলিত হওয়ার শুভ সংবাদ লাভ করেছেন, আমাদের কাছে এই প্রত্যাশাই রাখেন যে, পূণ্যকর্মে অগ্রগামী হও যেন খোদা তা'লার সাহায্যের ভাগীদার হও এবং জামাত সমষ্টিগত ভাবে উন্নতির ধাপগুলো বড় বড় পদক্ষেপে অতিক্রম করতে পারে। যেভাবে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলেছেন, স্থির পানি দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। সকল প্রকার পূণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং তাতে অগ্রসর হওয়া একজন আহমদীকে প্রকৃত অর্থে জামাতের উন্নতিতে অবদান রাখতে সাহায্য করতে পারে। একজন যুবককে সাহায্য করতে পারে, একজন শিশুকে সাহায্য করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শয়নে-জাগরণে, উঠতে-বসতে এই চিন্তা-ভাবনা আমাদের উপর আবশ্যক করে না নিব যে, আজ এই যুগে ইসলামের বিজয় আল্লাহ তা'লা হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর হাতেই নির্ধারণ করেছেন এবং আমরা হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর জামাতের একটি অংশ, যারা মসিহ মাওউদ (আ.)–এর হাত হয়ে খোদা তা'লার তকদীর বা নির্ধারিত বিষয় পূরণে অংশীদার হব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা "ফাস্তাবিকুল খায়রাত"-এর হক আদায় করতে পারব না। সুতরাং এই চিন্তা, এই ভাবনায় সর্বদা আমাদের মগ্ন থাকতে হবে। সূরা কাহাফেও যেখানে ধর্মকে হেফাজত করা, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষাকে রক্ষা করা এবং তার উপর আমল করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে সেখানে যুবকদের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কি আজ মুহাম্মদী মসিহর খোদ্দামগণ, সেই যুবকরা যারা এই অঙ্গীকার করেছে এবং খেলাফতের ছাঁয়াতলে পুনরাবৃত্তিও করে, তারা কি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে না? এবং ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির উপর বিজয়ী করার জন্য পূণ্য কর্মে অগ্রসর হবার এবং নিজ সঙ্গী-সাথীদের সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করবে না? আজও অবশ্যই করবে, ইনশাল্লাহ যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীরা করেছে।

বরং আমিতো কিছুকাল থেকে বেশ কিছু যুবকের চেহারায় সেই দৃঢ়তা দেখেছি, যারা এই কথা বলছে যে "আমরা নিজেদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে নিজ জ্ঞানকে বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধ করে আল্লাহ এবং তার বান্দার অধিকার আদায় এবং রক্ষা করে এই দেশের প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে এই জাতির ইহকাল এবং পরকাল সুসজ্জিত করার চেষ্টা করব, ইনশাল্লাহ।

আজ আমি যুককদের বলছি যে, অল্প কয়েকজনের ব্যাপারে নয় বরং সেই সকল যুবকগণ যারা নিজেদেরকে মুহম্মদী মসিহর সাথে সম্পর্কের দাবী রাখেন, আজকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, একটি অঙ্গিকারের নবায়ণ করতে হবে, আর এই অঙ্গীকার নবায়ন করে এখান থেকে উঠতে হবে যে ভালকাজে অগ্রগামী হতে এবং এর বিস্তারে আমরা সর্বপ্রকার কুরবানী দিব, নিজেদের পার্থিব লালসাকে পিছনে নিক্ষেপ করবো, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খোদ্দামুল আহমদীয়া এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেন যুবকরা তাদের দায়িত্বাবলী অনুভব করতে পারেন। যুবকদের মাঝে এই চেতনা প্রদীপ্ত হয় যে আমরা আহমদীয়া জামাতের একটি কল্যাণকর সত্ত্বা যাদের নিজেদের সকল প্রকার যোগ্যতা খোদাতা'লার আদেশ পালনের ও জামাতের উন্নতির জন্য নিজেদের ভূমিকা রাখতে, পূণ্যকাজে উত্তম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে আর এতে অগ্রগামী হতে ব্যবহার করতে হবে। এটা দেখবেন না যে আমাদের প্রবীণরা কি করছে? যদি প্রবীণরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে এটা ভাবা উচিত নয়, তাহলে আমরা কেন করব? তাদের দৃষ্টান্ত আপনাদের দেখা উচিত নয়। স্মরণ রাখবেন খোদাতা'লা কোথাও এটি বলেন নি যে, যদি তুমি অমুককে দেখে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না কর তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে আর তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে, যার কাজকর্ম তুমি দেখেছিলে সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে আর তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তিকে দেখে তোমরা নিজেদের সংশোধন করছ না সেই ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'লা কি আচরন করবেন তা আল্লাহ তা'লা সর্বোত্তম জানেন। প্রত্যেকের খোদা তা'লার সাথে নিজস্ব হিসাব নিকাশ থেকে থাকে কিন্তু খোদা তা'লার কথা না মানার কারনে তোমাদেরকে খোদা তা'লা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ তা'লা এটিই বলেছেন, সুতরাং কারো পূণ্য অন্য কাউকে মুক্ত করবে না আবার কারো অন্যায় কর্ম অন্য কাউকে শাস্তিযোগ্য করবে না । প্রত্যেকেই নিজ কাজের দায়ভার গ্রহন করবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খোদ্দামুল আহমদীয়া এজন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, যদি জামাতের প্রবীণরা কাজ না করেন তাহলে যুবকরা অগ্রগামী হোক এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব অনুভব করুক। লাজনা অগ্রগামী হোক এবং তাদের দায়-দায়িত্ব অনুভব করুক যেন জামাতের কাজ ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। এবং জামাতের নেযাম এবং সকল অধিনস্ত অঙ্গ সংগঠনও নিজের ভূমিকা পালনকারী হয়। "ফাস্তাবিকুল খায়রাত" অর্জনের জন্য প্রত্যেকেই প্রচেষ্টা চালালে জামাতের উন্নতি কয়েক গুণ হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ।

"ফাস্তাবিকুল খায়রাত"-এর আরেকটি অর্থ হলো যারা অগ্রগামী রয়েছেন তারা এক

পদক্ষেপ উপরে গিয়ে নিচে অবস্থানকারীদের হাত ধরে তাদেরকেও উপরে নিয়ে আসেন। যদি যুবকরা অনেক উপরে চলে যান তাহলে রশি নিক্ষেপ করে, মই লাগিয়ে দুর্বলদেরও উপরে উঠানোর প্রচেষ্টা করুন, যদি যুবকরা পূণ্য কাজে অগ্রগামী হয় তাহলে সত্যের প্রচার এবং সত্যকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতেও অগ্রসর হবে। বান্দার হক বা অধিকার প্রদা-নও অগ্রগামী হবে। সুতরাং যখন যুবকদের এই পদক্ষেপ অগ্রসর হবে, তাহলে প্রবীণদের মধ্যে দুর্বলতা যদি থেকেও থাকে তাহলে তাদের আপনা আপনিই লজ্জাবোধ হবে। আপনারা পথ প্রদর্শক হয়ে আল্লাহ তা'লার কল্যাণরাজীকে একত্রকারী হবেন। আমি এটা বলছি না যে খোদা তা'লা না করুক, এখানে বড়দের অধিকাংশ সৎকর্মের দিকে মনোযোগী নয় অথবা পৃথিবীর কোন দেশে এই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, আমি যুবকদের মস্তিস্কে এটি প্রবেশ করাতে চাই যে, 'আমরা তো বড়দের দৃষ্টান্ত দেখেছি' তাদের এই অজুহাত আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না। যুগ খলিফা যখন জামাতকে সম্বোধন করেন তখন তাতে যুবকরাও অন্তর্ভুক্ত হয় বৃদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটা কখনও কোন যুগ খলিফা বলেন নাই, এটা হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কোথাও বলেন নাই, এটা আঁ হযরত (সা.) কোথাও বলেন নাই, এটা কুরআন করীমের শিক্ষার কোথাও আমরা দেখি নাই যে, যুবকদের পূর্বে বৃদ্ধদের সম্বোধন করা হয়। যদি এটা হয়, যদি এরুপ কোন বিষয় থাকে তবে জামাতি উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বয়স্করা সংশোধন না হবেন, যুবকদেরও সংশোধন হতে পারে না। অতএব, প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব বুঝতে হবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য আপনাদের এক পৃথক সংগঠন বানানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে বুঝতে হবে যে, কেন আপনি পৃথকভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়া নামে চিহ্নিত! আর কেন সংগঠন তৈরী করা হয়েছে? এই উদ্দেশ্যের জন্য আপনাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও ইজতেমা হয় এবং আপনারা যুবক যাদেরকে ভবিষ্যতে জামাতের দায়িত্ব নিতে হবে। যদি আজ আপনারা এই উদ্দেশ্যকে বুঝেন যা আপনাদের সংগঠনের রয়েছে তাহলে ভবিষ্যতে যে যুবক আসবে তারা আপনাদের এই বিষয়ের উপর আঙ্গুল উঠাতে পারবেনা যে, আমাদের বড়রা কাজ করে না অথবা কাজ করে নাই আর উন্নতির গতি থেমে গেছে। কেননা কাল আপনারা বড় হবেন। এই কথাটি স্মরণ রাখুন যে, আজকের যুবক কালকের প্রবীণ। আর আপনার সংশোধন ভবিষ্যতে জাতি ও জামাতের উন্নতির পথ নির্ধারণ করবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই বাক্য বলে যুবকদের প্রতি এক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতির সংশোধন হতে পারে না। সুতরাং আপনারা আপনাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোন। যদি কোন বুযুর্গ যার আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং যিনি পূন্যকাজে অগ্রসর, যার উদাহরন আমরা বিভিন্ন ঘটনায় দেখতে পাই, যিনি পৃথিবীর জন্য জ্ঞান ও সুক্ষ্মতত্ত্ব শেখার মাধ্যম হয়ে থাকে, যিনি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এমন এক বুযুর্গকে যদি একটি শিশু একটি কথার উপর দৃষ্টি আকর্ষন করাতে পারে যে, যদি আমি পদস্খলিত হই তাহলে শুধু আমার আঘাত লাগবে কিন্তু যদি আপনার পদস্খলন হয় তাহলে একটি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনাদের ধারন-

ানুযায়ী যারা বড়দের মধ্যে দায়িত্ব পালন করে না তাদের সামনে আপনাদের মত একজন যুবকদের মধ্যেও "তোমরা পরস্পর উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা কর" এর উন্নত মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করাতে পারেন। আর শুধুমাত্র এটিই নয়, আপনারা যারা এই সময়ে পৃথিবীর সংশোধনের অঙ্গিকার করেছেন নিজেরা পূণ্যকাজের উত্তম নমুনা সৃষ্টির মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। নতুবা যেমনটি আমি প্রথম থেকে বলে আসছিলাম যে খোদাতা'লা জিজ্ঞেস করবেন তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব পালন করেছ? অঙ্গিকার তো বার বার করছ কিন্তু তা পূর্ণ করছ না। আর যেই জাতির মধ্যে তোমরা বাস করছ, এর চাহিদানুযায়ী তার অধিকার আদায় করনি। জার্মানের অধিকাংশ সত্যের সন্ধান করছে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা আহমদী যুবকদের কাজ। সুতরাং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় দুই ধরনের যুবক থাকে, এক তো পুরোপুরি যুবক যৌবনে সদ্য পদার্পণকারী। আরেকটি দল তারা, যাদের যৌবন শেষের দিকে, কিন্তু এখনও যুবক এবং খোদ্দমুল আহমদীয়ার শেষ বয়সে আছে। আপনাদের ছোট ভাই, বোন, শিশুরা আপনাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে। যদি আপনারা উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করেন, তাহলে তাদের পদস্খলনের কারন হবেন। যদি আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে আপনারা তাদের পদস্খলনের কারন হবেন। একজন আহমদী যুবক একই সময়ে সেই শিশু যে কিনা বুযুর্গকে শিক্ষা দিয়েছিল এবং সেই মুহূর্তে, সেই সময়ে সে একজন বুযুর্গ বটে। একজন খাদেম সেই শিশুও যে বুযুর্গকে শিক্ষা দিল এবং সে একজন বুযুর্গও যিনি পরবর্তী প্রজন্মকে পরিচালনা করবেন, যার পিছনে একটি প্রজন্ম আছে, এক জাতি আছে যাদের পথনির্দেশনা দিয়ে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা দেখানো তার কাজ। আর আমাদের যুবকগন, আমাদের খাদেমগন যারা নিজেদেরকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন, এই প্রকৃত বিষয়টি যখন জানতে পারবেন তখন এই পৃথিবী আপনাদের অধিনস্ত এবং আপনাদের পায়ের নিচে করে দেয়া হবে এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদের দেয়া হবে। আমরা ইনশাল্লাহ বিজয়ের এক নতুন দৃশ্য দেখব। সর্বদা মনে রাখুন, ধর্মের সেবা ও পুণ্যকাজে অগ্রসর হওয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বস্তু নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না। যেই সৎ নিয়তে আল্লাহ তা'লার কাছে সাহায্য চেয়ে অগ্রসর হবে, আল্লাহতা'লার কল্যাণরাজী পাবে। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা জামাতের সেবার মর্যাদা পায়। এটা শরীয়তেরও নিয়ম এবং প্রকৃতিরও নিয়ম। কোন জিনিসকে অর্জন করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয়। আর আল্লাহ তা'লা তো এটা বলেছেন, যে আমার দিকে আসবে, হেদায়ত অন্বেষণ করবে তাকে হেদায়াতের পথ দেখাব। এই হেদায়াত পাওয়া এবং এ জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ও পুণ্যকর্মের জন্য অগ্রসর হওয়াই এ যুগের জিহাদ যার জন্য মুহম্মদী মসিহ আহ্বান করছেন। যদি প্রাথমিক যুগের মুসলমান বাচ্চা, যুবক, মহিলারা নিজেদের প্রাণের কুরবানী দিয়ে নির্দ্বিধায় যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে ইসলামের প্রতিরক্ষা করে থাকেন তাহলে আজ ইসলামের প্রতিরক্ষা ও প্রচারের জন্য আমাদেরকেও প্রথমে সাহাবীদের (রা.) মত

খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজেদের কর্মকে সংশোধন করে সেই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যা পৃথিবীকে খোদা তা'লার পরিচয় করিয়ে দেয়, যা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জিহাদ, যা মুহম্মাদ (সা.) এর পতাকা পৃথিবীতে উড়ানোর জিহাদ। আজ মুহম্মদী মসিহ ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তলোয়ারের জিহাদের দিকে আহ্বান করেন না বরং নিজেদের আত্মার শুদ্ধির জিহাদের জন্য আহ্বান করছেন। নিষ্ঠার সাথে বয়াতের মাধ্যমে সিলসিলায় অন্তর্ভুক্তির দিকে আহ্বান করছেন। ইসলামের পবিত্র শিক্ষাকে পৃথিবী-তে ছড়িয়ে দেয়ার জিহাদের দিকে আমাদের আহবান করছেন। এই বাণী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমরা তখনই আদায় করতে পারব যখন নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে পুণ্যকর্মে অগ্রসর এবং অগ্রগামী হওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিব। সুতরাং হে আহমদীয়াতের খোদ্দাম! আজ যুগের মসিহ তোমাদের বলছেন যে, আস এবং নিজের অবস্থার পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর ধর্মের সুরক্ষাকারী হয়ে যাও। আজ যখন নিজেদের, উম্মতের অধিকাংশের মন্দ আচরণ ইসলা-মের দুর্নাম করছে তখন অন্যরা (বিধর্মীরা) প্রত্যেক দিক থেকে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা:) এর সত্ত্বার উপর অনবরত হামলা করছে এবং হামলার জন্য প্ররোচিত করছে। সকল মাধ্যম দ্বারাই আক্রমণ করা হচ্ছে।

আজ আহমদীরাই, আহমদী যুবকেরাই মুহাম্মদী মসিহ এর নেতৃত্বে ইসলামের উৎকৃষ্টতা দুনিয়ার সামনে প্রমান করবে। আজ ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) এর হেফাজতের জন্য তালহা (রা.) এর মত হাতের প্রয়োজন। তিনি সাতাশ আঠাশ বছরের যুবক ছিলেন যিনি ওহুদ এর যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.) এর চেহারার উপর নিজের হাত রেখে তীর আটকিয়েছেন এবং তীরের আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও উফ শব্দ পর্যন্ত করেন নি। এই জন্য যে উফ শব্দ করলে যদি হাত নিজের জায়গা থেকে সরে যায়। আজ ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) এর সুরক্ষার জন্য আবু দযানার মত বাহাদুরদের প্রয়োজন। আঁ হযরত (সা.) যখন তাঁকে নিজের তরবারি প্রদান করেছিলেন, তিনি আঁ হযরত (সা.) এর তরবারির অধিকার আদায় করেন এবং নিজের দেহকে আঁ হযরত (সা.) এর দেহের সামনে দাঁড় করালেন আর তীর বর্ষণে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। যদিও আজকের যুগ তীরের আক্রমন থেকে নিরাপদ নয় তবুও এই যুগ তরবারি চালানোর নয়। কিন্তু আজকেও ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) এর শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য সেই উদ্দীপনা এবং আবেগের প্রয়োজন, যা আমাদের পূর্বপুরুষগন দেখিয়েছেন। এই যুগে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর ইলমে কালাম এর সাথে একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যেন ইসলামের উপর কৃত প্রত্যেক আঘাতের মোকাবেলা করা যায় এবং কোন তীর আঁ হযরত (সা.) এর চেহারা এবং দেহ পর্যন্ত না পৌছাতে পারে।

খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানি বা খোদ্দমুল আহমদীয়া ইউ কে যাদের আজ ইজতেমা হচ্ছে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যে খোদ্দাম রয়েছে, একইভাবে মহিলা বা লাজনা ইমাইল্লাহর

দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা যেন নিজেদের আকাঙ্খা ও অভিরুচির পরিবর্তন সাধন করে। পার্থিব কামনা বাসনার প্রতি অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্তে ধর্মের কাজ কর্মে অগ্রগামী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। ধর্মের প্রতি অগ্রগন্য থাকার অনুভূতি সৃষ্টি করুন। তবলীগের ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকার উত্তেজনা সৃষ্টি করুন। বর্তমানে মাত্র দু'শ, তিন'শ-চার'শ খোদ্দামের ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রকৃত সাহায্যকারীর মজলিসে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও তবলীগের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই যথেষ্ট নয়। বরং পুরো খোদ্দামুল আহমদীয়াকে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লার সেই নির্দেশকে মনে রাখতে হবে যে, তোমাদের মূল উদ্দেশ্য "ফাস্তাবিকুল খায়রাত" যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি জার্মান জাতি ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। সারা পৃথিবীর একদিকে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয় তবে অন্য অংশে ইসলামের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর এক অংশ ইসলাম বুঝতেও আগ্রহী। আর ইসলামের প্রকৃত চিত্র শুধু আহমদীরাই প্রদর্শন করতে সক্ষম। তাই একাজে একান্ত নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমাদের যুবকরাও অপব্যয় ও নিরর্থক খেল-তামাশার পিছনে ছুটতে থাকে তবে সত্যান্বেষী পৃথিবীবাসীকে কে শামাল দেবে? যদি আহমদী যুবকদের কানে আজকের যুগের আবিস্কারাদি; এম পি থ্রি বা অন্যান্য সংগীত ও গান শুনার জন্য এয়ার ফোন লাগানো থাকে তবে আপনাদের সমাজে পুণ্যের বাণী কে প্রচার করবে? কে আছে যে পুণ্যের পথে অগ্রগামী হয়ে পশ্চাৎবর্তী লোকদের টেনে তোলার জন্য সচেষ্ট হবে? এমপি থ্রি বা অন্যান্য যে সকল সাম্প্রতিক আবিস্কারাদি নিজেদের জায়গায় তো এগুলি ঠিকই রয়েছে কিন্তু এগুলির অপব্যবহার ঠিক নয়। ধর্মের চাহিদার জন্য এ গুলির সঠিক ব্যবহার যথেষ্ট পরিমানে করুন এবং এগুলি কানেও লাগান আর শুনতে থাকুন যেন ধর্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমানাদি আপনাদের আত্মস্থ হয়।

একজন আহমদী যুবককে সবসময় এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে আর সেটি অর্জনের জন্য তাকে অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে হবে। সত্যবাদীতাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করতে হবে এবং একে বিশেষ নিদর্শনে পরিনত করতে হবে। জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষার প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। কেননা ইসলামের বিজয় আপনাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তবলীগের ক্ষেত্রে আপনাদের আত্মনিয়োগ, আপনাদের শিক্ষা ও মারেফাতের ক্ষেত্রে উন্নতি, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করার উপর ইসলামের প্রতিরক্ষার বিষয়টি নির্ভরশীল। আপনাদের মূল উদ্দেশ্য "ফাস্তাবিকুল খায়রাত" হওয়া উচিত, এরপর আল্লাহ তা'লা আরও বলেন, "আয়নামা তাকুনু ইয়াতে বিকুমুল্লাহ জামিয়ান" অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। যদি তোমরা এই মূখ্য উদ্দেশ্যকে ধারণ না কর, আর নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে আখ্যা দাও এবং আঁ হযরত (সা.) এর প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান দাস-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবার দাবি কর। অথচ নিজেদের মূল উদ্দেশ্য পার্থিব চাকচিক্যের উপর রাখ এবং অলসতা উদাসীনতা তোমাদের মূল উদ্দেশ্যের

পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তবে এমন একদিন আসবে যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। আর সেদিন সেই অলসতা ও উদাসীনতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং একজন আহমদীর উচিত যেসব দায়-দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয়েছে কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন না করে সেগুলো পালন করা। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, একদিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করে নিয়ে আসা হবে। অতপর জবাবদিহীতার দরুন তোমরা লজ্জিত ও ধৃত হবে। সুতরাং সেটি আমাদের জন্য এক ভয়ানক অবস্থা হবে। একজন আহমদীর বিশেষ ভাবে চিন্তিত হওয়া উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, আমাদের যুবকদের নিজস্ব অভিরুচি পরিবর্তন করা উচিত কেননা আমাদের নিজেদের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে আর সমাজের সংশোধনও আমাদের হাতেই ন্যাস্ত। কারন আমরা সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বলে নিজেরা দাবী করে থাকি। খোদা করুন যেন আমরা এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি বুঝতে পারি এবং পৃথিবীর জন্য আলোকবর্তিকাবাহী হতে পারি। খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)।

অনুবাদঃ মাওলানা রইস আহমদ

(মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ।)

২০১০ - আহমদীয়া জামাতের এক আশিষপূর্ণ বছর

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

আজ এ বছরের শেষ দিন। অর্থাৎ যা বর্তমানে প্রচলিত গ্রীক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজ শেষ দিন। অন্যদিকে ইসলামী সালের প্রথম মাসের শেষ দশ দিন আরম্ভ হয়েছে। কেননা যেহেতু পৃথিবীতে এ সময়ে প্রচলিত ক্যালেন্ডার এটাই, যা মুসলমান অমুসলমান সবাই ভালোভাবে অবহিত আর বর্তমানে এ ক্যালেন্ডার সমস্ত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। তাই এ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সবাইকে নতুন বছরের মোবারকবাদ দিচ্ছি। এ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সদ্য চলে যাওয়া বছরকে বিদায় জানানো হয়। যাই হোক বিদায় জানানোর রীতি নীতি তো অনেক কম কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিনকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ-উল্লাসের মাধ্যমে বরণ করা হয়। এ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি নিজেদের রীতি নীতি অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করে। যাই হোক যেভাবে আমি আজকের দিনের কথা বলেছি আজকের দিনটি ২০১০ সালের শেষ দিন। প্রত্যেক বছর শেষ দিন আসে আবার চলে যায় এতে কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আমাদের জন্য এ বছর এবং এ শেষ দিনও কল্যাণ-মন্ডিত। কেননা এ বছরের সমাপ্তি আজ জুমআর দিনের মাধ্যমে হচ্ছে। এ ২০১০ সালের আরম্ভও কল্যাণমন্ডিত জুমআর মাধ্যমে হয়েছিল। যেভাবে আমি বলেছি যার সমাপ্তি কল্যাণমন্ডিত জুমআর মাধ্যমে হচ্ছে। লোকেরা কথার কথা বলতে পারে বরং বলেও বেশ আচ্ছা কল্যাণমন্ডিত দিন! কতিপয় ফিতনাবাজ আহমদী বিরোধী আহমদী-গণের আবেগকে উত্তেজিত করার জন্য এ কথা বলতে পারে তোমাদের জন্য খুব ভাল বছর অতিবাহিত হয়েছে যাতে আহমদী জামাতের প্রায় ১০০ জনকে জীবন দিতে হয়েছে। একশতটি পরিবার নিজ সন্তানদের, পিতাদের, নিজ আত্মীয় স্বজনদের জন্য সহানুভুতি প্রদর্শন করেছেন, আবার এ রকম বড় সংখ্যায় নির্দয় ব্যক্তিও আছেন যারা কঠোর হৃদয়ের। যে সকল ব্যক্তি এ শহীদগনের দৃষ্টান্ত দিয়ে কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছে এবং করে যাচ্ছে। নিয়মিত শাসিয়ে যাচ্ছে আমরা তোমাদের সাথে আরো অনেক কিছু করব। এ সকল লোকের মাঝে মনুষ্যত্ব নেই। এরা এমন মানুষ যারা দেখে নাই খোদা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করছে। যে বিপদ তাদের উপর আপতিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি বরং পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে কোরআন করিমে আল্লাহতা'লা যেমন বলেছেন "কাসাত কুলুবুহুম"(সূরা আনআম-৪৪) আয়াত মোতাবেক। তাদের হৃদয়

এগুলোকে দেখে আরো বেশী শক্ত হয়ে গেছে এবং দুষ্টামীতে আরো বেশী অগ্রগামী যাচ্ছে। “ওয়া যাইয়ানালাহুমুশ শায়ত্বানু মা কানু ইয়া’মালুন” (সূরা আল আনআম-৪৪) অর্থাৎ তারা যা করছে শয়তান তা আরো সুন্দর করে দেখাচ্ছে। এ সকল লোকেরা এটার সত্যায়ণকারী হচ্ছে। কাজেই এ সকল লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত নয় যে তারা আহমদীদের জীবন নিয়ে নিয়েছে, আমরা তাদের কষ্ট দিব তাদেরকে বিশেষভাবে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করব। তাদেরকে শয়তান যা সুন্দর করে দেখাচ্ছে আল্লাহ্ তা’লা তো তা পূর্বেই কুরআন করীমে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ ধরনের লোকেরাই এমন কাজ করে অত:পর খোদাতা’লা তাদের জন্য অনেক পরিতাপও করেছেন। অপরদিকে আমাদের শহীদগনের পরিবারের বিষয় তারা তো তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে হা হুতাশ করার পরিবর্তে নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে খোদা তা’লার দরবারে এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তাদের চিন্তা চেতনাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি বিভিন্ন দেশ থেকে শহীদগনের পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য স্থানীয় আহমদীদের প্রেরণ করেছি। এ প্রতিনিধি দল যখন শহীদগনের পরিবারের সাথে সাক্ষাত করে আসে তো তাদের মাঝে ঈমানের উন্নতি দেখতে পায়। গত কয়েক দিন পূর্বে আফ্রিকা থেকে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরন করেছি তাদের মাঝে ঘানার একটি দল ছিল। সেই দলে ঘানার আমীর ও মিশনারী ইন্‌চার্জ ওয়াহাব আদম সাহেবও ছিলেন। আরেকজন তাহের হামন্ড সাহেব যিনি ঘানীয়ান আহমদী ছিলেন। তিনি ঘানার পার্লামেন্টেরও সদস্য । তারা ফেরত যাওয়ার সময় আমার সাথে সাক্ষাত করে যায়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে শহীদগনের আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে সাক্ষাত করে আমাদের ঈমানী উন্নতি হয়েছে। আমরা সেখানে তাদের যে চেহারা দেখেছি আমরা তা কখনো কল্পনাও করতে পারি নাই। আমরা যখন তাদের সান্ত্বনা দিতাম তারা আগেই নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রকাশ করে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিত। এ বন্ধুগন বলেন আমাদের আবেগের অতিশয্যে চোখে পানি গড়িয়ে পড়তো। তারা বলত আমাদের ছেড়ে যাওয়ারা তো সিল লাগিয়ে গেছেন। আসলে ঐ সকল শহীদগনের পরিবারের অবস্থা এরূপ ছিল। একজন আহমদী ছাত্র যে কিছুদিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য ইউ,কে তে এসেছে সে গতকালই আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি-ল। সে আমাকে বলেছে আজ আমি আপনাকে আমার মায়ের একটি দুঃসাহসিকতার কথা বলতে চাই। মসজিদে এই ছাত্রের দুটি গুলি লেগেছিল। সে বলে আমি আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় আমার মাকে ফোন করে বলি এভাবে গুলি লেগেছে আর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। মা প্রতিউত্তরে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি। যদি শাহাদাত বরণ নির্ধারিত হয় (সংবাদ আসছে লোকেরা শহীদ হচ্ছে) তাহলে সাহসিকতার সাথে জীবন আল্লাহতা’লার দরবারে উপস্থাপন করবে। কোন ধরনের কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না। যাই হোক এই ছেলেকে আল্লাহ তা’লা রক্ষা করেছেন। অপারেশন করে গুলি বের করা হয়েছে। কাজেই যে জাতির মাঝে এ ধরনের মা বিদ্যমান, যারা নিজ সন্তানদের শাহাদত বরনের জন্য প্রস্তুত করছে যে সকল শহীদগণের এ মানের আত্মীয় স্বজন রয়েছে যারা

সহানুভূতি প্রদর্শনকারীদের সান্তনা দেয়। তাহলে এ রকম জীবন উৎসর্গ খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি বা শাস্তির কারন হতে পারে না। হৃদয়ের প্রশান্তির উদ্দেশ্যই এ সৌভাগ্য আল্লাহতা'লার বিশেষ ফজলে হয়ে থাকে। আমি তো আগেও বলেছি যখনই শহীদগণের আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলেছি তো তাদের দৃঢ়চিত্ত্বতার কথাই শুনতে পেতাম। সুতরাং বাহিরের দেশ থেকে সমবেদনা প্রদর্শনকারীদের ঈমানের উন্নতি, মায়েদের নিজ সন্তানকে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত করা, আত্মীয় স্বজনদের দৃঢ়চিত্ততা এগুলো আল্লাহ তা'লার ফজল নয়তো আর কি? আমরা তো এমন জাতি যারা শত্রুর ভয়ে কখনো খোদার আঁচল পরিত্যাগকারী নই। আমাদের প্রিয় খোদার অবিশ্বাসী নই। বরং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজউন বলে পুনরায় নিজ প্রিয় খোদার ভালবাসা লাভ করার চেষ্টা করি যেন নিজ প্রিয় খোদার সন্তুষ্টি লাভ করে সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যারা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভকারী। অনেকে এমন আছেন যারা আমাকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করেন তারা ঐ সকল লোকদের অর্ন্তভূক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, "ওয়া মিনহুম মাই ইয়ানতাযেরু" (আল-আহযাব:২৪) অর্থাৎ তাদের মাঝে এমনও আছে যারা অপেক্ষমান, যদি আল্লাহতা'লার নিকট থেকে কোরবানী নেয়া অবধারিত হয়ে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'লা তারা এর মাঝে অগ্রগামী থাকবে। সুতরাং তোমরা কিভাবে বছরের শুরু এবং শেষকে কল্যাণমন্ডিত বলছ? কারো এ অভিযোগ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন-কারীদের জবাব দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। এ বছর যে ব্যাপকভাবে ধনী দরিদ্র সকল দেশে আহমদীয়াতের সুন্দর শিক্ষা পৌঁছেছে ও পরিচিতি লাভ করেছে, এটা খোদাতা'লার অগণিত ফজল ও কল্যাণেরই প্রমাণ। এ বছর ঐ সকল শহীদগণের কোরবানী যেভাবে আমাদের আবেগ অনুভূতিকে সংবরন করে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বাণী জগতের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছে, এত ব্যাপকভাবে জামাতের পরিচিতি ও ইসলামের শিক্ষা পূর্বে কখনো পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সেটা ইউরোপে হোক বা আমেরিকায় অথবা এশিয়ায় বা আফ্রিকায় এ সকল দেশে ব্যবহার হয়েছে। কোরবানী দিয়েই জাতিসমূহ সফলতা লাভ করে। পাকিস্তানের শহীদগণ এই যে কোরবানী দিয়েছে বা দিচ্ছে যা ২০১০ সালে চরম সীমায় পৌঁছেছে, এ কোরবানী কখনো বৃথা যাবে না, ইনশাআল্লাহ। বরং বলা যায় বৃথা যাচ্ছে না। এ কোরবানীর ফলেই পৃথিবীর সর্বত্র আহমদীয়াতের শিক্ষার এত ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে। আর এ ধারা অব্যাহত আছে। অবশ্যই এটি কোরবানী গৃহীত হওয়ার প্রমাণ। আহমদীয়াতের বিজয়ের লক্ষণাব-লী প্রকাশ পাচ্ছে এবং বিজয়ের যে উজ্জল্য ইনশাআল্লাহ তা'লা ভবিষ্যতে তা অনেক ব্যাপকভাবে উজ্জলতর হয়ে দেখা দিবে। সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ তা'লা আমাদের কোরবানীকারীদের কোরবানী কে গ্রহন করত তাদেরকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের ব্যাপারে কোরআন করীমে খোদা তা'লা বলেন, "ওয়া লা তাহসাবান্না আল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহইয়াউ ইনদা রব্বিহীম ইউরযাকুনা" অর্থাৎ যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের রাস্তায় শহীদ করা হয়েছে তোমরা

তাদের মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত; তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে। সুতরাং তারা তো আল্লাহ তা'লার ফজলে চিরস্থায়ী রিযক লাভ করছে যা প্রতিনিয়ত তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে। এখানে আমওয়াত শব্দের মানে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এটাও হবে যে তার রক্ত বৃথা যাবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি নিজের রাস্তায় চলার জন্য দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। কাজেই আমাদের দোয়া করা উচিত আমরা যেন কোরবানীকারীদের নেকীসমূহকে জীবিত রাখতে পারি। তাদের কোরবানীর কারনে যে সফলতা লাভ হচ্ছে আল্লাহতা'লার ফেরেশতাগন তা তাদের অবগত করতে থাকেন । এর ফলে তারা নিজেদের জীবন দেয়ার পরও আনন্দিত হয় কেননা তারা খোদার সন্তুষ্টিও লাভকারী হয় এবং তাদের কোরবানীও সর্বোচ্চ উত্তম ফল বয়ে আনে । এর দৃষ্টান্ত সূরা আল ইমরানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "ফারিহীনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাজলিহী ওয়া ইয়াস তাবশিরুনা বিল্লাযিনা লাম ইয়াল হাকুবিহীম মিন খালফিহীম আল্লাখাউফুন আলাইহীম ওয়া লাহুম ইয়াহযানুন"(আল ইমরান :১৭১) অর্থাৎ: আল্লাহ নিজ ফজল দ্বারা তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা খুব আনন্দিত। তারা তাদের পিছনে রেখে যাওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে সু-সংবাদ পাচ্ছে যে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদেরও কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃচিন্তাগ্রস্থ হবে না।

কাজেই সেই সকল শহীদগনের কোরবানী আমাদের ঈমানের উন্নতির কারন হচ্ছে। আল্লাহতা'লার এ সু-সংবাদ শ্রবণ করে তাদের রেখে যাওয়া বংশধরগণের সু-সংবাদ পাচ্ছে। এ ব্যাপারে শহীদগণের বংশধরদের বড় সংখ্যা আমার কাছে চিঠি লিখছে, আমি স্বপ্নে অমুক শহীদের সাথে সাক্ষাত করেছি, নিজ শহীদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে ভাই, বাবা, ছেলের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তারা বলেছে আমরা খুব ভাল আছি। এখানে আমাদের সাথে বড় অদ্ভুত ব্যবহার হচ্ছে। তোমরা তো এটার ধারনাও করতে পারবে না। যখন আমরা তাদের কাছ থেকে সু-সংবাদ শুনি তো নিজেদের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে আল্লাহ তা'লা তাদের বিশেষ রিযক দিচ্ছেন। আল্লাহতা'লা তাদের আনন্দের সংবাদ পৌঁছাচ্ছেন তো এতে আমাদেরও বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আল্লাহতা'লা পিছনে রেখে যাওয়াদের সফলতার যে সংবাদ তাদেরকে প্রদান করছেন তাও ইনশাআল্লাহ তা'লা অবশ্যই সত্য বলে প্রমানিত হবে। বরং তা হচ্ছে, আল্লাহ যখন কোন সিদ্ধান্ত করেন তো ক্রমান্বয়ে ফলাফল সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়। মানুষ সাধারনত বুঝতে পারে না কিন্তু যখন চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় তখন জানতে পারে আল্লাহতা'লার ওয়াদা কত সত্য। তিনি কত সত্য অঙ্গীকারকারী খোদা! কাজেই আল্লাহতা'লার ওয়াদাসমূহ হতে অধিক থেকে অধিকতর কল্যাণ লাভের জন্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশী তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। আমরা নিজেদের কোরবানীকারীদের নেক কাজের কথা বলি। তাদের নেকীর উল্লেখ করি। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। কিন্তু আমাদের নিজেদের আমলের হিসাব নেয়া উচিত যেন আমরা আল্লাহতা'লার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জামাতের যে সফলতা লাভ হওয়ার কথা, যার সুসংবাদ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানীকারীদেরকে তার ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছে, আমরাও যেন সফলতার অংশ হতে পারি।

আমি এই কল্যাণমন্ডিত জুমআর কথা বলেছি। এ বছর আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে একটি বিশেষ দিন প্রদান করেছেন। এরূপ কখনো কখনো হয়ে থাকে। এ বছর এ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যার উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি অর্থাৎ জুমআ দ্বারা শুরু এবং সমাপ্তও জুমআ দ্বারা হয়েছে। সাধারনভাবে এক বছরে বায়ান্নটি জুমআ হয় কিন্তু এ বছর আমরা তিপ্পান্নটি জুমআ পেয়েছি। হাদীস অনুযায়ী জুমআ হচ্ছে সেই দিন যেদিন একটি মুহূর্ত এমন আসে যাতে আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দার দোয়া বিশেষভাবে কবুল করেন। (বুখারী-হাদিস নং: ৫২৯৪)

আমি আশা রাখি পূর্বেও অনেক বার দৃষ্টি আকর্ষন করেছি আমাদের নিজেদের চেষ্টা অনুযায়ী জুমআ সমূহ দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। লাহোরে আমাদের ভাই যারা শহীদ হয়েছেন, মর্ডানেও শহীদ হয়েছেন তারাও জুমআর দিন আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়ারত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। অবশ্যই তাদের দোয়া জান্নাতে তাদেরকে উত্তম রিযক প্রদানের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে এ দোয়া পিছনে ছেড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং জামাতের উন্নতির সু-সংবাদ পৌঁছানোর কারনও হচ্ছে। আজ পুনরায় এই শেষ জুমআর দিন নিজেদের বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত।

জুমআর দিন যেখানে কল্যাণমন্ডিত সেখানে তা আদম সন্তানের জন্য ভয়েরও কারন। কেননা হাদিসে এসেছে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, জুমআর দিন হচ্ছে দিনগুলোর নেতা আর আল্লাহ তা'লার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত দিন। এটা এই দিন আল্লাহর কাছে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও প্রিয়। এই দিনের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লাহতা'লা এই দিনে হযরত আদম (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দিন আল্লাহ তা'লা হযরত আদম (আ.) কে মৃত্যু দিয়েছেন। এই দিন একটি মূহুর্ত এরূপও আছে যাতে বান্দা হারাম বস্তু ছাড়া যা আল্লাহর নিকট যাচনা করে তা তাকে দেয়া হয়। আর এই দিন কেয়ামতও হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড় ও সমূদ্র এ দিনকে ভয় করে (সুনান ইবনে মাজা-হাদিস নং: ১০৮৪)

সুতরাং এই দিনের কল্যাণ লাভের জন্য নিজেদের জীবন আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করা আবশ্যক। এ দিনে যেখানে সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত লাভের উপকরণ রয়েছে অপরদিকে শয়তানের পাল্লায় পড়ে মন্দ কাজ-কর্ম করে জান্নাত থেকে বের হওয়ার সংবাদও রয়েছে। আমরা যারা এ যুগের আদমের মান্যকারী আল্লাহতা'লা হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কেও আদম নামে সম্বোধন করেছেন। তাকে আল্লাহতা'লা খলিফা ও সুলতান বানিয়েছেন। কাজেই বর্তমানে পৃথিবীতে এই আদমের মাধ্যমেই জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনিই শেষ জান্নাতেরও বন্দোবস্ত করবেন। যখন তার দ্বারাই নতুন জগত ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হবে তিনি তো কোন প্রাকৃতিক আকাশ বা পৃথিবী বানাবেন না। বরং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সত্যবাদী দাসের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী সৃষ্টি হবে। যারা খোদার সন্তুষ্টিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিবেন। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক জামাত প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আকাশ ও নতুন জগত সৃষ্টির

চেষ্টা করবেন। তারা ত্যাগ, তিতিক্ষার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্টিত হবেন। সৎকর্মপরায়ণ হবেন। সৎকর্মে প্রভূত উন্নতি করবেন। আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। কাজেই যদি আমরা এ যুগের ইমামের সাথে কৃত অঙ্গীকার থেকে কল্যাণ নিতে চাই এবং দুই জগতের কল্যাণের অধিকারী হতে চাই তাহলে খোদাতা'লার নৈকট্য প্রদানকারী আমল করা আবশ্যক। আল্লাহতা'লার সকল ছোট বড় নির্দেশের উপড় নিজের শক্তি-সামর্থ্য মোতাবেক আমল করা আবশ্যক যেন আমরা সেই উন্নতির অংশ হতে পারি যা আল্লাহতা'লা নির্ধারিত করেছেন। সেই সকল সুসংবাদের অংশ হতে পারি যা আমাদের কোরবানীকারীদের দেখানো হচ্ছে। সুতরাং আমাদের কেবল এতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে আল্লাহতা'লা কখনো কোরবানীকে নষ্ট করেন না। হযরত মসিহ মাউদ (আ.) এর সাথে আল্লাহতা'লার ওয়াদা রয়েছে আমি তোমাকে বিজয় দান করব। এগুলো হবে আর ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই বাছাই করা জরুরী আল্লাহতা'লা বলেন, " ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাহুম আজরুন গায়রুমামনুন"(হামীম সিজদা-৯) অর্থাৎ: নিঃসন্দেহে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে এবং সে অনুযায়ী নেক কর্ম করে তাদের প্রতিদান কখনো শেষ হবার নয়। কাজেই ঈমানের সাথে নেক আমল করাও জরুরী। হযরত মসিহ মাউদ (আ.) বলেন, "আমি আমার জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলছি, সৎকর্ম করা আবশ্যকীয়। যদি আল্লাহর নিকট কোন বস্তু গ্রহণীয় হয় তো তা হচ্ছে সৎকর্ম। [মলফুযাত ১ম খন্ড পৃ:১৪]

সুতরাং ঈমান আনার পরে সৎকর্ম সম্পাদন অবিচ্ছেদ্য বস্তু। আল্লাহতা'লার নির্দেশ অনুয-ায়ী জীবনকে সাজানোর নামই হচ্ছে আমলে সালেহ। এর বদৌলতে যে পুরস্কার রয়েছে তা আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী কখনো শেষ হবার নয়। আল্লাহ তা'লা কোরআন করীমের একস্থানে আমলে সালেহের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, "ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু। কুল্লামা রুযিকু মিনহা মিন সামরাতির রিযকান কালু হাযাল্লাযি রুযিকনা মিন কাবলু ওয়া উতুবিহী মুতাশাবিহা। ওয়া লাহুম ফিহা আযওয়াজুম মুতাহ্‌হারাতুন ওয়া হুম ফিহা খালেদুন।" (বাকারা- ২৬)। অর্থাৎ: যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তুমি তাদের কে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য এমন বাগান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত। তাদেরকে যখন সেই বাগান থেকে রিযক স্বরূপ কোন ফল দেয়া হবে তখন সে বলবে, এটা তো সেই ফল যা আমাদেরকে পূর্বেও দেয়া হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে তাদের নিকট এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রিযক দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য সেই বাগানসমূহে পবিত্র জোড়া প্রস্তুত রাখা হবে। তারা সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। এ ব্যাপারে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন, "এ আয়াতে ঈমানকে আমলে সালেহের মুখাপেক্ষী রাখা হয়েছে অর্থাৎ জান্নাত ঝরনা সমূহ। তার মানে হচ্ছে ঈমানের ফলে জান্নাত পাবে আর আমলে সালেহের ফলে ঝরনা। কাজেই যেভাবে বাগান ঝরনা বা পানি ছাড়া দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায় তা টিকতে পারে না।। অনুরূপভাবে ঈমানও আমলে সালেহ ব্যতিত কোন কাজের নয়। অতঃপর আরেক

স্থানে ঈমানকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে মুসলমানদেরকে যে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয় তা একটি বৃক্ষ আর আমলে সালেহ সেই বৃক্ষে পানি সিঞ্চন করে। সুতরাং এ ব্যাপারে যত বেশি চিন্তা করা হবে ততই তত্ত্বজ্ঞান বেরিয়ে আসবে। যেভাবে একজন কৃষকের চাষাবাদে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে যেন বীজ বপন করে। অনুরূপ ভাবে খোদা তা'লার আধ্যাত্মিক ভূমি বর্ষণের মানে হচ্ছে ঈমান যা আধ্যাত্মিকতার বপন আবশ্যক। অতঃপর যেভাবে কৃষক জমি বা বাগানে পানি সিঞ্চন করে অনুরূপ আধ্যাত্মিক বাগানের সেচ হচ্ছে আমলে সালেহ। স্মরণ রেখ! যেভাবে আমলে সালেহ ছাড়া ঈমান নিস্প্রভ অনুরূপ যত ভাল বাগানই হোক পানি বা সেচ ছাড়া অথবা অন্য কোন মাধ্যম ছাড়া তা নিস্প্রভ।

তিনি (আঃ) বলেন,"বৃক্ষ যত ভাল জাতেরই হোক বা উত্তম ফল প্রদানকারী হোক যখন মালিক পানি সেচের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করে না তো এর পরিনাম কি হবে তা সবাই জানে। আধ্যাত্মিক জগতেও ঈমান নামক বৃক্ষের একই অবস্থা । ঈমান হচ্ছে একটি বৃক্ষ মানুষের আমলে সালেহ আধ্যাত্মিকভাবে পানি সিঞ্চনের জন্য ঝরনা বা নদী হয়ে পানির কাজ করে। যেভাবে একজন কৃষকের বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন ছাড়াও পরিশ্রম ও চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে হয়। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও বরকতের উত্তম ফল লাভের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা আবশ্যক করেছেন। (মলফুযাত ৫ খন্ড পৃ:৬৪৮-৬৪৯)

সুতারাং স্থায়ী পুরস্কার লাভ করতে হলে, কল্যাণ লাভ করতে হলে, দোয়া কবুলের দৃশ্য দেখতে হলে আমলে সালেহ করা আবশ্যক। তাদের জন্য সু-সংবাদ যারা নিজেদের ঈমানকে আমলে সালেহ দ্বারা সাজিয়েছেন। যারা এ ঘোষণা করেছে, আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে যুগ ইমামকে মান্য করেছি, তারা নিজেদের অবস্থা ও আমলসমূহকেও আল্লাহ তা'লার শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনার চেষ্টা করুন। কাজেই আজকেও সেই দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন আমাদের জীবনকে সেইভাবে অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করেন যা আমাদেরকে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর জামাতের প্রকৃত হকদার বানাবে। আমাদের সকল ইবাদত, সকল আমল যেন কেবল খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। আজ রাতে এ বছরকে বিদায় জানানোর জন্য এই দোয়া করুন। আল্লাহর নিকট বিশেষ সাহায্য চান তিনি যেন আমাদের দূর্বলতাসমূহ দূর করার সামর্থ্য দান করেন। গত বছর নিজেদের দূর্বলতার দরুন যে নেক কাজ করতে পারিনি এ বছর যেন আমরা তা করতে পারি। ঈমানের বীজকে সর্বদা যেন আমলে সালেহ দ্বারা পানি সিঞ্চন করে প্রতিনিয়ত উন্নতিকারী হই। আমাদের উঠাবসা যেন খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়। একদিকে তো আমরা আনন্দিত, জামা'তের একটি দল নিজেদের কোরবানী দিয়ে তবলীগের রাস্তা প্রসারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যদিকে আমি একটি কথা আফসোসের সাথে বলতে চাচ্ছি, আমার নিকট কতিপয় গয়ের আহমদীর এরূপ চিঠিও আসে, অমুক ব্যক্তি আপনার জামা'তের। সে আমার সাথে ব্যবসা করেছে; ব্যবসায়ী অংশীদার ছিল অথবা ঋণ নিয়েছে এখন সে ধোকা দিচ্ছে। সুতরাং এ রকম মানুষ যারা

জামা'তের দুর্নামের কারণ, এ ধরনের মানুষই তারা যারা মুখে তো ঈমান আনার দাবী করে; আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের এ দাবী কোন কল্যাণ পৌঁছায় না। এ ধরনের মানুষ তো জামা'তের উন্নতির পরিবর্তে জামা'তের দূর্নামের কারন হয়। এরপর পরস্পর সম্পর্কের বিষয় রয়েছে। একজন আহমদীর আরেকজন আহমদীর সাথে পরস্পর এমন সম্পর্ক থাকা উচিত যা এক আত্মীয়ের সাথে অন্য আত্মীয়ের সাথে হওয়া উচিত। যদি তাদের মাঝে তা প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে মানুষ এ থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। দোয়া থেকেও কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আমলে সালেহের মাঝে সকল অধিকারও বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজের আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখি গত বছর আমি নিজের মধ্য থেকে কি কি মন্দ দূরীভূত করেছি? আমাদের কোরবানী দাতাগণ আমাদের নিজেদের জীবনে, নিজেদের প্রকৃতিতে কি পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে এ বছর যা সূচনা এবং সমাপ্ত জুমআর মাধ্যমে হয়েছে এবং হচ্ছে তা আমাদের জন্য কল্যাণমন্ডিত বছর হবে। কিন্তু যদি আমরা জাগতিকতায় মত্ত থাকি, এতই নিমজ্জিত থাকি যে একজন আরেজনের অধিকার খর্ব করি, স্বামী-স্ত্রী, ননদ-ভাবী, শাশুড়ী, ব্যবসায়ী অংশীদার একে অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করি, একে অপরকে অপমানিত- লাঞ্ছিত করি, নিজের স্বভাব চরিত্রে, কথা-বার্তায় মন্দ শব্দ ব্যবহার করি তাহলে আমরা কল্যাণ লাভকারী তো নই বরং আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টি ক্রয়কারী হব। আমাদের কোরবানী দাতাদের মৌখিক দাবীকারক তো হব কিন্তু আমরা তাদেরকে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বানানোকারী হব না। যদি আমাদের স্বভাব চরিত্রে পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা তাদের প্রশান্তির উপাদান সৃষ্টি করিনি। উচিত ছিল যদি আহমদীয়াতের বিরূদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আমাদের কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা হয় তাহলে আমাদের নিজেদের ঈমানকে আমল দ্বারা সাজিয়ে খোদার নিকট উপস্থাপন করা। যদি আমাদের বিরুদ্ধে আগুন প্রজ্জলিত করা হয় তো আমাদের উচিত সেই আগুন থেকে খাঁটি হয়ে বের হওয়া। সুতরাং আমাদের মধ্য থেকে যার গতবছর এভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে আমল দ্বারা সুন্দর করেছে সে সৌভাগ্যবান। আগমনকারী বছরে এ থেকে এ আগুনকে ঠান্ডা করার জন্য আমাদের চোখের পানি এভাবে নির্গত হয় যা আমাদের ব্যক্তি জীবনেও এক বিপ্লব সাধন করে। এ সম্পর্ককে আল্লাহ তা'লা দৃঢ় করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন। যে সকল সদস্য নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নি তারা আজ রাতের দোয়ায় এবং এখন জুম'আতে বিশেষ দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন নেক কাজ করার সামর্থ্য দান করেন। আগত বছরে নিজের সংশোধনের বিষয়টি সর্বদা সামনে রাখুন। এটি সম্মুখে রেখে আল্লাহ তা'লার নিকট সাহায্য যাচনা করে নেক কাজ করার চেষ্টা করুন। নিজেদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ করুন আমরা সবাই যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের আমলকে সুন্দর করি। আজকের রাত পশ্চিমা জগতের অধিকাংশরা মদ্যপান ও নাচ গান এবং হৈ হুল্লোড়ে মগ্ন থাকবে। এ সময় আমরা নিজেদের আবেগ অনুভূতি আল্লাহ তা'লার দরবারে এই অঙ্গিকারের সাথে উপস্থাপন করব যে,

আগামী বছর এবং সর্বদা আমাদের আবেগ অনুভূতি আল্লাহ তা'লার নির্দেশের উপর আমল করত তাঁর দরবারে অবনত থাকব। আমরা নিজেদের ঈমানে উন্নতির চেষ্টাকারী হব। আমাদের প্রত্যেক অবস্থা, প্রতিটি কর্ম আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এরূপ করার শক্তি দান করুন এবং আমাদের দোয়া কবুল করুন। আগমনকারী বছর সকল আহমদীদের জন্য এককভাবে এবং জামাতী ভাবে অগণিত কল্যাণমন্ডিত বছর হোক।

আমি আল্লাহ তা'লার ফজলের কথা বলতে চাই। এ বছর আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এটাও একটা ফজল দান করেছেন। যার উল্লেখ আমি জলসার দ্বিতীয় দিন যে রিপোর্ট প্রদান করি তাতে পূর্বেও উল্লেখ করেছি। রাশিয়ান ডেক্সের মাধ্যমে এম.টি.এ তে এখন রাশিয়ান অনুষ্ঠানও আরম্ভ হয়েছে। খুৎবাসমূহের অনুবাদ এবং ওয়েব সাইটও আরম্ভ হয়েছে। পূর্বে কখনো কখনো দু একটি রাশিয়ান আহমদীর চিঠি পত্র আসতো সংখ্যায়, একেবারেই কম। এখন আল্লাহ তা'লার ফজলে তা হাজার হাজার সংখ্যায় উন্নীত হয়েছে। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ইলহামও রয়েছে, রাশিয়ায় বালি কোণার মত আহমদীয়াত কে বিস্তার লাভ করতে দেখেছেন। (তাযকিরা পৃ- ৬৯১)

আল্লাহ করুন এ বাণী যেন তাদের নিকট দ্রুত গতিতে পৌঁছাতে থাকে। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় যেন এ ইলহাম পূর্ণ হতে দেখি। আজ আমি আরো একটি কথা বলতে চাই আমি এ কথা কাদিয়ান জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে বলতে চেয়েছিলাম যে, www.alis-lam.org নামক আমাদের যে ওয়েব সাইট আছে তাতে আল্লাহ তা'লার ফজলে এক নতুন সংযোজন করা হয়েছে। রুহানী খাজায়েন নামে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর যে পুস্তকসমূহ রয়েছে সেগুলোকে এমন এক সার্চ ইঞ্জিনে দেয়া হয়েছে। যদি আপনি কোন কিছু খুঁজতে চান তাহলে আপনি যেকোন শব্দ যেমন আল্লাহর নাম, ঈসা (আঃ) নাম, মুহাম্মদ (সা.) এর নাম তাতে লিখলে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক রুহানী খাজায়েনে যেখানেই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেই নাম এবং পৃষ্ঠা সামনে চলে আসবে। অত:পর সেটাকে সার্চ করে যারা ইন্টারনেট বা alislam এ আগ্রহ রাখেন তারা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাও দেখতে পারবেন যা বইয়ের মূল পৃষ্ঠা । এটা একটা অনেক বড় সেবা এবং এটা খুব কঠিন কাজ ছিল। আল্লাহর ফজলে আমাদের যুবকদের দল এটা করেছেন। তাদের মাঝে দুইজন ওয়াকফে নও, একজন নুমান আহমদ লাহোরের এবং আরেক জন করাচির মোবারক আহমদ। এছাড়া ভারতের ছেলেরা রয়েছে। এ কারনে ঘোষণা করতে চেয়েছি-লাম তিনজন ছাড়া বাকী সবাই ভারতের। ফজলুর রহমান চেন্নাইয়ের, একই ভাবে মাকসুদ আহমদ, শাহেদ পারভেজ, আব্দুস সালাম এবং আয়েশা মাকসুদ সাহেবা ব্যাঙ্গালুর। অত:পর আলতাফ আহমদ ব্যাঙ্গালুরের ও নিয়াজ আহমদ মাঙ্গুর এবং একজন হচ্ছেন খুররম নাসির পাকিস্তানের, কালিমুদ্দিন শেখ চেন্নাইয়ের। আসলে এটা অনেক বড় কাজ যা তারা করেছে। যারা দেখে তারা তো এতটা অনুভব করে না। প্রতিটি পুস্তক পাঠ করা, পাঠ করে প্রতিটি শব্দ বের করা এবং তারপর ইনডেক্স বানানো, তারপর সেই পৃষ্ঠায় প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা অনেক বড় কাজ। যা আল্লাহ তা'লার ফজলে এ সকল যুবকগণ করেছেন।

আল্লাহ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কার দান করুন এবং জগত এ থেকে কল্যাণ গ্রহণ করে। আপত্তিকারীরা তো সবসময় হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর পুস্তকসমূহের উপর আপত্তি করে যদি তারা দেখে তাহলে এটাই একটি ধন-ভান্ডার যা জগতের সংশোধনের কারন হতে পারে। কিন্তু যাদের উপর কোন প্রভাব পড়ে না, তারা তো কোরআন করীমের আয়াতেরও হাসি ঠাট্টা করে। তাদের উপর কোন প্রভাব পড়ে নি। আল্লাহ তা'লা জগতের মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

আজ আমি তৃতীয় কথা যেটি বলতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে আমি জানতে পেরেছি আজকাল ইন্টারনেট ও অন্যান্য সাইটে আমার নামে ফেসবুক একাউন্ট রয়েছে। ফেসবুকের একটি একাউন্ট খোলা হয়েছে যার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। না আমি কখনো খুলেছি আর না এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ আছে। বরং আমি তো কিছু দিন পূর্বে জামা'তকে দিক নির্দেশনা দিয়েছি তারা যেন এটা থেকে বেঁচে চলে। এতে অনেক অনিষ্ট রয়েছে, জানিনা কেউ হয় তো বোকামী করে এমনটি করেছে। কোন বিরুদ্ধবাদী করেছে না কি কোন আহমদী নেকীর উদ্দেশ্যে করেছে। কিন্তু যে কারনেই করা হোক তা তো বন্ধ করার চেষ্টা চলছে এবং ইনশাআল্লাহ বন্ধ করা হবে। কেননা এর ক্ষতিকর দিক বেশি, উপকারী দিক কম। বরং ব্যক্তিগতভাবেও অনেককে বলে থাকি যে ফেসবুক এর মাধ্যমে অনেক সময় ভুল কথা বেরিয়ে যায়। যা তার নিজের জন্যও দুঃচিন্তার কারন হয়। বিশেষভাবে মেয়েদের তো সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু যাই হোক আমি এটি ঘোষণা করে দিতে চাচ্ছিলাম, যাদের ফেসবুক একাউন্ট আছে, যারা পড়ছে এবং অভিমতও দিচ্ছে তা একেবারে ভুল পদ্ধতি। এ কারনে এটা থেকে বেঁচে চলুন। কেউ যেন এতে অংশগ্রহণ না করে। যদি কখনো এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তো যাতে জামাতীভাবে ফেসবুকের মত কোন কিছু চালু করতে হয় তাহলে তা নিরাপত্তার সাথে চালু করা হবে। তাতে সবাই ঢুকতে পারবে না, কেবল জামা'ত কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে আর এতে যাদের আগ্রহ আছে তারা যেন এগিয়ে আসে। কেননা আমাকে বলা হয়েছে কতিপয় বিরুদ্ধবাদীও এতে নিজের অভিমত দিয়েছে। অনুমতি ব্যতীত আরেক জনের নামে কাজ করা এমনিতেই সঠিক নয়, তা নেক নিয়তেই হোক না কেন। এ কারনে যদি কেউ নেক নিয়তে করে তাহলে যেন দ্রুত সে বন্ধ করে দেয় এবং ইস্তেগফার করে। যদি দুষ্টামী করে করে তাহলে আল্লাহ তাকে ধৃত করবে। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন এবং জামাতকে উন্নতির পথে পরিচালিত করুন,আমিন।

(৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সালে বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুৎবা।)
অনুবাদঃ মাওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ।

যুগ খলিফার তাজা নির্দেশনা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

খলীফাতুল মসিহ্ আল খামেস

প্রকাশনায়ঃ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১ ।